মণিভদ্র।

বৌদ্ধযুগের

ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইউনিভার্সিটি লেকচারার, সংস্কৃত কলেজের দ॰শাস্ত্রাধ্যাপক,
ইউনিভার্সিটি এম্ এ পরীক্ষক, মায়াবাদ প্রভৃতি
গ্রন্থলেখক ও গীতাশাঙ্কর ভাষ্যের
অনুবাদক

পণ্ডিত

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

বিরচিত।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা,

৯১-২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ "নববিভাকর যন্ত্রে"

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

প্রায় দুই বৎসর হইল, এই ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র উপন্যাসটী "শিল্প ও সাহিত্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। গত বৎসর হইতে জগজ্জ্যোতিঃ নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মাসিকপত্রে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাসিক পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত মণিভদ্র পাঠ করিয়া আমার কয়েক জন সাহিত্যসেবক বন্ধু এই উপন্যাসটীকে পুস্তকাকারে পৃথক্ মুদ্রিত করিয়া, প্রকাশ করিতে অতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, আমি এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস খানি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এই উপন্যাসটীকে ঐতিহাসিক এই আখ্যা দিবার কারণ এই যে, ইহাতে যে কয়টী পুরুষ ও নারীচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশই বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া শ্রাবস্তী, রাজগৃহ এবং কৌশাম্বী প্রভৃতি এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাস্থলগুলিও বৌদ্ধ ইতিহাসে তীর্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আরও একটী বক্তব্য এই যে,—যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত, তাহা অবদান ও জাতক নামে প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে—ঈষৎ আকার পরিবর্ত্তন করিয়াই গৃহীত হইয়াছে। এই কারণে এই উপন্যাসটীকে ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া, বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং সাধারণতঃ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই—আমাদের বালক বালিকাগণের মধ্যে নৈতিকশিক্ষা দান দ্বারা চরিত্রোৎকর্ষ-সাধন—

একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উজ্জ্বল ও একান্ত মনোহর উৎকৃষ্ট আদর্শ অঙ্কিত করিয়া সাহিত্যের সাহায্যে জন সাধারণের মধ্যে চারিত্রোৎকর্ষ সাধন করিবার আবশ্যকতা—প্রাচীন ভারতে কোন যুগেই উপেক্ষিত হয় নাই, ইহার প্রমাণ—সংস্কৃত সাহিত্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ঐসকল সাহিত্যের মধ্যে জাতক ও অবদান নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিলেও বোধকরি অত্যুক্তি হইবে না। ঐ সকল জাতক ও অবদান গ্রন্থ গুলিতে যে সকল মহনীয় চারিত্রোৎকর্ষের আদর্শগুলি অতি সুন্দর ও নির্দ্দোষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই আদর্শগুলিকে আমাদের ভাষায় পুনর্ব্বার সময়োপযোগিভাবে চিত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে, উহা আমাদের তরুণবয়স্ক ছাত্রবৃন্দের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইতে পারে, এই আশায় কয়েকটা জাতক ও অবদান গ্রন্থের আদর্শ অবলম্বনে আমি এই উপন্যাসখানি সংকলন করিয়াছি। এ বিষয়ে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করিবার ভার সহৃদয় পাঠকগণের উপর নির্ভর করিয়া আমি বিনীতভাবে এই গ্রন্থে সম্ভাবিত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পরিশেষে "শিল্প ও সাহিত্যের" সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী এবং "জগজ্জ্যোতির" সুযোগ্য সম্পাদক—শ্রদ্ধেয় শ্রমণক বহুশ্রুত শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ভিক্ষু, এই দুই মহানুভাব ব্যক্তিকে—মণিভদ্রের প্রতি তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য, আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক—ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আগমনবার্ত্তা।

শ্রাবস্তী নগরে বড় ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে, অনাথপিণ্ডিক-রাজগৃহে ভগবান্ শাক্যসিংহকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে—নিজ কর্ণে তাঁহার সংসার-তাপহর অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া সে আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে; অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তী নগরের একজন বড় ধনী বণিক্, ভারতের সকল বড় বড় নগরেই তাহার বাণিজ্য বিস্তৃত। অনাথপিণ্ডিক—সচ্চরিত্র, উদার, দাতা ও ধার্ম্মিক বলিয়া, শ্রাবস্তী নগরে সকলেরই প্রিয়। ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক সাক্ষাৎ ভগবানের মুখে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের কথা শুনিয়া, অনাথপিণ্ডিকের সংসার-তাপক্লিষ্ট হৃদয়ে এক নূতন শান্তির আলোক দেখা দিয়াছে। সে স্থির করিয়াছে যে, এই নব অভ্যুদিত বৌদ্ধধর্ম্মের যাহাতে প্রসার ও স্থিতি হয়, তাহাই —তাহার অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র প্রধান কার্য্য।

বুদ্ধদেবের অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে, সে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহার জন্মভূমি শ্রাবস্তীর প্রত্যেক লোককে তাহাই অনুভব করাইতে—সে বিনয় ও

ভক্তিভরে শাক্যসিংহকে শ্রাবস্তীতে আসিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, দয়াময় ভগবান্ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন—তাঁহার শিষ্যবৃন্দের সহিত তিনি শ্রাবস্তীতে আসিতে স্বীকার করিয়াছেন, এই সুখের সমাচার লইয়া, অনাথপিণ্ডিক আজ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়াছে, যাহারা তাহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, তাহাদের নিকট এই সুখের বার্ত্তা জানাইবার সময়—অনাথপিণ্ডিকের দুনয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বহিয়াছিল।

ভক্তিভরে যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া, প্রাতঃকালে উঠিতে পারিলে, এখনও জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানব আপনাকে নিরাপদ্ বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই মহা-পুরুষকে স্বচক্ষে দেখিবে—এবং সাক্ষাৎ তাঁহার মুখে সুধাময় উপদেশ শুনিয়া, বিশ্বজনীন প্রেমের আস্বাদনে আত্মাকে কৃতার্থ করিবে—এই সুখের ভাবনায়, অনাথ-পিণ্ডিক ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ আজ দিশেহারা হইয়াছে। কোন্ পথে তোরণ প্রস্তুত করিতে হইবে, কোন্ পথ দিয়া ভগবান্ নগরে প্রবেশ করিবেন, কোথায় দাঁড়াইলে নাগ-রিকগণ নির্নিমেষনেত্রে প্রাণভরিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে—এই সকল ব্যাপার লইয়া, অনাথপিণ্ডিক ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত।

এ জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা সকলেই ভালবাসে—অথবা সকলেই যাহা মন্দ দেখে; একজনের কাছে যাহা মন্দ, অপরের কাছে আবার তাহাই ভাল, কেন এমন হয়? কে বলিবে?

শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠিকুলের মধ্যে সামন্তভদ্র নামে একজন বড় ধনী বণিক্ ছিল। রত্নভদ্র, সুভদ্র ও মণিভদ্র—তাহার তিনটী পুত্র। সামন্তভদ্রের অগাধ ধন—সুতরাং সমাজে তাহার শক্তিও অপরিসীম। ভারতের সকল নগরের প্রধান প্রধান বণিকের সহিত সামন্তভদ্রের কোন না কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা ছিল। সামন্তভদ্র প্রাচীন—তাহার বাটীতে সর্ব্বদাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পদধূলি পড়িত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি সামন্তভদ্রের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল—তাহার বাটীতে বড় বড় যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে—তাহার পুরোহিতের করুণা কটাক্ষে, যে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ না করিত, সে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আসনে বসিতেই পারিত না—বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

শ্রাবস্তীতে শাক্যসিংহ আসিবেন—নূতন ধর্ম্ম ও নূতন সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন করিবেন, যে ধর্ম্মে ও যে সংঘে বেদ প্রবেশ করিতে পারে না—যে ধর্ম্মে ও যে সঙ্ঘে ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা কুণ্ঠিত, সে ধর্ম্ম ও সে সঙ্ঘ—কখনই বেদমার্গানুগত ও ব্রাহ্মণসেবক বৃদ্ধ সামন্তভদ্রের প্রিয় হইতে পারে না।

তাই শ্রাবস্তীর ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণগণ সামন্তভদ্রের গৃহে সমবেত হইয়া, স্থির করিলেন যে, শাক্যসিংহ যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেত্তা, বেদে অবিশ্বাসী এবং ব্রাহ্মণের প্রভুতাদ্বেষী, তখন, তাহার অভ্যর্থনায় কোন ব্রাহ্মণ যোগ দিবেন না, সঙ্গে সঙ্গে সামন্তভদ্র এবং তাহার পক্ষের

সকল বণিকই একে একে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারাও কেহ শাক্যসিংহের অভ্যর্থনায় যোগ দিবে না; এমন কি, যদি তাহাদের কোন আত্মীয় এই প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে, তাহারা সকলে মিলিয়া, তাহাকে তাহাদের সমাজ হইতে বহির্ভূত করিবে।

অনাথপিণ্ডিক যথাসময়ে এই সকল ব্যাপারই শুনিল, নগরের অধিকাংশ লোকই ক্রমে সামন্তভদ্রের দলে মিশিতেছে, ইহাও বুঝিতে তাহার অণুমাত্র বিলম্ব হইল না। নগরের যখন এরূপ অবস্থা--তখন, কোন্ সাহসে ভর করিয়া, সে ভগবানকে শ্রাবস্তীতে আনয়ন করে? অনেক ভাবিয়াও, সে কিছুই কুল কিনারা করিয়া উঠিতে পারিল না, অবশেষে সে স্থির করিল যে, এরূপ অবস্থায় এ নগরে শাক্যসিংহের না আসাই শ্রেয়ঃ। তখন সে কান্দিতে কান্দিতে কম্পিতহৃদয়ে—চঞ্চলহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া, একজন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা—তাহা ভগবানের কাছে পাঠাইয়া দিল

যে সময় পত্রবাহক রাজগৃহে পৌঁছিল, তখন ভগবান্ শাক্যসিংহ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন পত্রবাহক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া, পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিল। প্রসন্নবদনে পত্রবাহককে উঠিতে বলিয়া, ভগবান্ পত্রখানি শারীপুত্রের হস্তে দিয়া, পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, শারীপুত্র পড়িলেন—

শ্রীচরণোপান্তে দাসের কায়মনোবাক্যে প্রণাম—

ভগবন্!

শ্রাবস্তীর অধিকাংশ লোকেরই মতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছে, আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আপনি এ নগরে পদার্পণ করিবেন না, পারি ত মরিবার পূর্ব্বে রাজগৃহে যাইয়া, আর একবার শ্রীচরণ দর্শন করিব। ইতি—হতভাগ্য দাস অনাথপিণ্ডিক।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া, শারীপুত্র ভগবানের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—সমগ্র শ্রমণমণ্ডলীও নিস্তব্ধভাবে—ভগবানের অভিপ্রায় কি? তাহা জানিবার জন্য—তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া—অপেক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশার নিশার শেষ প্রহরে পূর্ব্বাকাশে ক্ষীণ চন্দ্রকলার ন্যায়, সেই নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভিক্ষু-মণ্ডলীর মধ্যে—ভগবানের গম্ভীর ও প্রশান্ত বদনে একটু মৃদু ও উজ্জ্বল হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তখন, তিনি শারীপুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নিজের মঙ্গল নিজে সহজে বুঝিতে চাহে না, ইহাই ত মানবের স্বভাব! আমি শ্রাবস্তীর প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যাইয়া, পবিত্র ধর্ম্মের মঙ্গলবার্ত্তা স্বয়ং শুনাইব। ভিক্ষুগণ! আজি হইতে শ্রাবস্তী পবিত্র ধর্ম্মের একটী প্রধান লীলা ভূমি হইবে।”

তখন ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে—অবনতমস্তকে ভগবানকে অভিনন্দন করিয়া, সেই শারীপুত্রপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ

ভগবানের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন. ভগবান্ সেইক্ষণেই শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গোল বাধিল।

অনাথপিণ্ডিক যখন শুনিল যে, ভগবান্ তাহার মুখের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, প্রাণের প্রার্থনাটী শুনিয়াছেন,—তখন তাহার মনটা যে কেমন হইল, তাহা কয়জন বুঝিবে ? সে তখন—প্রাণপণে ভগবানের অভ্যর্থনার সমারোহে লাগিয়া গেল। শ্রাবস্তীর প্রতিকূল ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর প্রতিকূলাচরণ ও তাহাদের সামর্থ্যের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া যখনই তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইত, তখনই, তাহার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিত যে, যখন স্বয়ং ভগবান্ আসিতেছেন, তখন, এই সকল বাধা বিপত্তি কিছুই টিকিবে না, ঝড়ের সম্মুখে তূলার ন্যায় এ সকল বাধা উড়িয়া যাইবে ! আশার এইরূপ আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া, অনাথপিণ্ডিক—প্রতিকূল ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং সামন্তভদ্রের শক্রতার কথা আর মনে আসিতে দিল না। সে প্রাণ ভরিয়া, ভগবানের অভ্যর্থনার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল। পথে পথে বিচিত্র তোরণ শ্রেণী—দুই ধারে ফুলের মালা—প্রতি তোরণ দ্বারে কদলীবৃক্ষযুক্ত পূর্ণকুম্ভ—দুই ধারের লোকদিগের দেখিবার সুবিধার জন্য, মধ্যে মধ্যে বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত উচ্চ মঞ্চ—ইত্যাদি

আড়ম্বরের কোন ত্রুটীই রহিল না। আগামী কল্য জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রভাতে—শাক্যসিংহ ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গে লইয়া, নগরে প্রবেশ করিবেন। তিনি অদ্য শ্রাবস্তী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে—জীর্ণ আম্রকাননে বাস করিতেছেন,—সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ নগরে প্রচারিত হইল, অনাথপিণ্ডিক আত্মীয় ও বিশ্বস্ত লোকের হস্তে অভ্যর্থনার অন্যান্য ভার দিয়া—স্ত্রী, পুত্র ও পরিজন লইয়া—সন্ধ্যাকালেই তাড়াতাড়ি জীর্ণ আম্রকাননের অভিমুখে যাত্রা করিল।

এ দিকে সামন্তভদ্রের বাটীতে বড়ই একটা গণ্ড গোল বাধিয়া উঠিল, ঘন ঘন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পদার্পণ —প্রহর প্রহর ব্যাপিয়া নিভৃত পরামর্শ—আর সামন্তভদ্রের মুখে সর্ব্বদা কেমন একটা যেন উদ্বেগের ছায়া! সে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের পরামর্শ শুনিয়া, যতই অগ্রসর হইতেছে—ততই, যেন তার প্রাণে কেমন একটা বিষম ভার বোধ হইতেছে, প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ আছে, তাহার ভিতর হইতে—কে যেন তাহাকে বলিতেছে যে, "সে যে পথে যাইতেছে, সে পথটা ভাল নহে! জগতের দুঃখ মিটাইবার জন্য যিনি নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে যাওয়াটা ভাল নহে।" নানা পরামর্শে—নানা ষড়যন্ত্রে দিনটা কোন রকমে কাটিয়া গেল। ও সর্ব্বনাশ! রাত্রি এক প্রহরের সময় সে শুনিল, মণিভদ্র—তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মণিভদ্র জীর্ণ আম্রকাননে অনাথপিণ্ডিকের সঙ্গে গিয়া, শাক্যসিংহকে

নগরের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আসিয়াছে। এ সংবাদ যেন বজ্রপাতের ন্যায় তাহার কাণে বাজিয়া উঠিল, তাহার—কনিষ্ঠপুত্র শ্রাবস্তীর নাগরিকগণের প্রতিনিধি হইয়া, শাক্যসিংহকে নগর প্রবেশের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে—এ কথা শুনিলে, তাহার দলের লোক তাহাকে কি বলিবে? তারপর সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাহাকে অগ্রসর করিয়া, শ্রাবস্তীতে নাস্তিকতা প্রচারে বাধা দিবেন বলিয়া, এত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা—সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অগ্নিপ্রতিম ব্রাহ্মণকুল—আমার পুত্রের এই দুর্বিনয়ের কথা শুনিয়া, কি করিয়া বসিবেন? ইহা ভাবিয়া, সামন্তভদ্র ব্যাকুল হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সামন্তভদ্রের আত্মীয়গণ সকলেই মণিভদ্রের এই অবৈধ আচরণের উল্লেখ করিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিল; কেহ বা রাগিয়া দুই এক কথা শুনাইয়াও দিল। মণিভদ্রকে ত্যাগ না করিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহার বাটীতে আর এজন্মে পদার্পণ করিবেন না, একথাও শুনিতে তাহার বেশী বিলম্ব হইল না।

জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র দুইটির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তখন, সামন্তভদ্র—অগ্রে বাটীর ত্রিতলের উপর একটী ঘরে মণিভদ্রকে চাবি দিয়া আবদ্ধ করিল। তারপর গললগ্নীকৃতবাসে—গণ্যমান্য হইতে অতি সামান্য পর্য্যন্ত—সকল আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণের বাটীতে, স্বরূপে বা পুত্ররূপে

হাজির হইয়া, সে জানাইল যে, "এ বার ক্ষমা করুন, মণিভদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করাইব, তাহাকে যে শাস্তি দিতে চাহেন—অসঙ্কোচে দিবেন, আমি নীরবে তাহা সহ্য করিব; এই অবৈধ কার্য্যের শান্তির জন্য আমি একটা বড় গোছের যজ্ঞও করিতে প্রস্তুত আছি: মণিভদ্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আর এমন কার্য্য হইবে না হইবে না" ইত্যাদি বিনয় বাক্যের ছটায়—আত্মীয়গণের অভিমানে ঘৃতাহুতি দিয়া, শেষ রাত্রিতে সামন্তভদ্র বাটী ফিরিল। পুত্রদ্বয়ও কিছু পূর্ব্বে বাটী ফিরিয়াছিল। অসীম পরিশ্রমের পর বিছানায় পড়িতে না পড়িতে—সামন্তভদ্র ঘুমাইয়া পড়িল। তখনও প্রভাত হইতে প্রায় ছয় সাত দণ্ড বাকী, সামন্তভদ্রের বিশাল প্রাসাদ—প্রকাণ্ড অন্তঃপুর—সেই নিশার শেষ ভাগে, একটা প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বে শান্ত হ্রদের ন্যায়, নিস্তব্ধতার শান্তিময় ক্রোড়ে আবেশে ঘুমাইয়া পড়িল।

পলায়ন।

চল পাঠক, একবার মণিভদ্রের সংবাদ লওয়া যাক। ঐ দেখ—মণিভদ্র, সেই তেতালার চিলের ছাতের ঘরে অবরুদ্ধ, তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই—সে কি করিয়াছে? কিসের জন্য বাটীর লোক হঠাৎ বিরূপ হইয়া, তাহাকে চিলের ছাতের ঘরে বন্ধ করিল? ইহা এখনও সে বুঝিয়া

উঠিতে পারে নাই। অল্প দিন হইল, তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, আহা! মার সে বড় আদরের ছেলে ছিল, এই আঠার বৎসর বয়সেও মার কোলে শিশুর ন্যায় মাথা রাখিয়া না শুইলে, তাহার নিদ্রা আসিত না. অকস্মাৎ সেই স্নেহময়ী মাতার শোক পাইয়া, মণিভদ্র শরতের রৌদ্রে কেতকী ফুলের ভিতরে সাদা সাদা কচি পাতার ন্যায়, আপনা আপনিই শুকাইয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছিল, এই যে—শাক্যসিংহের শ্রাবস্তীতে আসার ব্যাপার লইয়া, তাহাদের বাটীতে এত গোলযোগ চলিতেছে. এ সকল বিষয়ে তাহার দৃষ্টিই ছিল না সে সর্ব্বদাই অনন্যমনস্ক হইয়া, তাহার মায়ের কথাই ভাবিত। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে—বাড়ীর লোক বিরক্ত হইবে বলিয়া, সে অনেক কষ্টে তাহার চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতে শিখিতেছিল। আজ সন্ধ্যাকালে তাহার মনটা অকস্মাৎ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সে তখন একবার বাটীর বাহির হইয়াছিল; একাকী অন্যমনস্কভাবে কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে, সে জীর্ণ আম্রকাননে গিয়া পড়িয়াছিল; সেখানে অনাথপিণ্ডিকের সহিত তাহার দেখা হয়, তাহারই অনুরোধে, সে এক মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য সেই আম্রকাননের মধ্যে প্রবেশ করে; সেই বাগানের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বটের ছায়ায়, সে—ভিক্ষুমণ্ডলীপরিবৃত যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছে এবং যাঁহার কথা শুনিয়া, তাহার আত্মার আত্মা—কি জানি কি

এক নূতন শান্তিরসের আস্বাদ পাইয়াছে, যাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকিয়া, সেই শ্রীমুখের অমৃতময় উপদেশধারা পান করিবার জন্য, তাহার প্রাণের ভিতর একটা তীব্র পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে সেই ভগবান্ শাক্যসিংহের দর্শন করিয়াছিল বলিয়া, ভাই, বন্ধু, পিতা ও পরিজন সকলে, তাহার উপর এতটা বিরক্ত হইল কেন? ইহার কারণ সে খুঁজিয়াই পাইতেছে না। কারণ কি তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, অথচ তাহার নিকটে বাটীর একজন লোকও আসিতেছে না, হায়! কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সে এই কথাটা বুঝিয়া লইবে।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে শুক্লপক্ষের 'চতুর্দ্দশ'র চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মৃদুবাহী শীতল সমীরণের তরঙ্গে তরঙ্গে পাপিয়ার স্বরলহরী উঠিতেছে ও মিশাইতেছে, আজ সে মধুর স্বরলহরীও কিন্তু তাহার কর্ণে প্রবেশই করিতেছে না, সেই অস্তগমনোন্মুখ চাঁদের দিকে চাহিয়া, একটী ছোট জান্‌লার উপর উপবিষ্ট মণিভদ্র—তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন; সময়ে সময়ে ভাবিতে ভাবিতে তাহার বাহ্যজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সে কিন্তু, এই অপমান, ক্ষুধা তৃষ্ণা বা ক্লেশের কথা ভাবিতেছে না—

সে ভাবিতেছে—ইহারা এমন করিয়া, আমাকে কত দিন বন্দী করিয়া রাখিবে? আমার তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া

যাইতেছে, একটু জলও কি ইহারা দিবে না? কেন? আমি কি অকার্য্য করিয়াছি? যাহার জন্য—আমার এই মহাপাপীর ন্যায় সাজা! ক্ষুধায়—তৃষ্ণায় না হয় মরিয়াই গেলাম! তাহাতেই বা ক্ষতি কি? দুই দিন আগে ত কোন ক্ষতিই ছিল না—মা যখন মরিয়া গিয়াছেন তাঁহার জন্য—আবার তাঁহার কোলে শুইয়া মা মা বলিয়া প্রাণভরে ডাকিবার জন্য—প্রাণ কতই না ব্যাকুল হইয়াছে। মরিয়া যাই—তাঁহার কাছে চলিয়া যাই—মরিয়া যদি আবার সেই মাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে ত, মরা আমার পক্ষে বড়ই ভাল, কিন্তু কই? আজ ত মরিতে ইচ্ছা করিতেছে না; মরিলে ত আর তাহার দেখা পাইব না, তিনি যে কাল—কালই বা কেন, আর কয়েক দণ্ড পরে, এই শ্রাবস্তী নগরে আসিবেন—তেমনি করিয়া মৃদুহাস্যে স্বর্গের জোৎস্না বিকাশ করিতে করিতে, আবার যখন—তিনি সেই মধুর গম্ভীর স্বরে প্রাণের প্রসুপ্ত আশা জাগাইয়া আপামর জনসাধারণের চক্ষের সম্মুখে, শান্তির সুধাময় প্রস্রবণ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিবেন, আর আমি—তখন, সেখানে যাইতে পারিব না—তাঁহার সেই সরল ও পবিত্র ব্যবহার, সেই প্রসন্ন ও মধুরবাণী—সেই অপার্থিব গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য! হা দৈব! আমার ভাগ্যে আর একবারও কি দেখা ঘটিবে না?

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে—সেই ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণাব্যাকুল যুবক পরিশ্রমের অবসাদে অবসন্ন হইয়া,

শুইয়া পড়িল; অতর্কিতে নিদ্রার আবেশে—ক্ষণকালের জন্য তাহার নয়নদ্বয় মুদিয়া আসিল; সে সময় তাহার পরিশ্রান্ত ও কল্পনাময় মস্তিষ্কে, কতকগুলা এলোমেলো ভাবের স্রোত বহিতেছিল। হঠাৎ—দ্বারের চাবি খুলিবার শব্দের ন্যায়—কি যেন একটা শব্দ হইল, অমনি—তাহার নিদ্রার আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, দ্বারের দিকে চাহিতে না চাহিতে, হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে মণিভদ্র দেখিল—কি দেখিল ? সেই অস্তাচলোন্মুখ চতুর্দ্দশীর চাঁদের অমল ধবল জ্যোৎস্না, সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষেরমধ্য দিয়া, রুদ্ধ কপাটের উপর পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ কপাট খুলিবামাত্র বোধ হইল, যেন সেই জ্যোৎস্নার মধ্য হইতে এক জ্যোৎস্নাময়ী নারীমূর্ত্তি সেই ক্ষুদ্র কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, সে—বালিকা কি যুবতী, তাহা বুঝিবার যো ছিল না; নিবিড়কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশরাজির মধ্যে, সে ছোট সুন্দর মুখখানি—অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার উপায়ও ছিল না, তাহার বসন বড়ই শুভ্র—গলে একগাছি বড় বড় মুক্তার দোদুল্যমান শুভ্র হার—মণিভদ্র ভাল করিয়া তাহাকে দেখিতে না দেখিতে, সেই রমণীমূর্ত্তি আরও অগ্রসর হইল, ও দুই হাতে মণিভদ্রের হাত দুইখানি ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া, অতি ধীরস্বরে বলিল,—মণিভদ্র ! চুপ কর, কথা কহিও না, তুমি আমাকে চিন না, চিনিবার

কোন প্রয়োজনও নাই, এখন অন্য কথা কহিবার অবসরও নাই, মণিভদ্র! তুমি কি ভগবানকে দেখিতে যাইবে?

বিস্ময়ে—হর্ষে ও উৎকণ্ঠায়—মণিভদ্রের মুখে বাক্য সরিল না, তাহার প্রাণের ভিতর কি যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব তাড়িতস্রোত বহিতেছিল, সে কোন কথা না বলিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল, তখনও সেই রমণী তাহার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, তখন—

অতি ধীরে—অতি সাবধানতার সহিত রমণী আবার বলিল, যাও মণিভদ্র! যতশীঘ্র পার, পলাও,—তোমার পিতার মতি-চ্ছন্ন হইয়াছে, সূর্য্যের আলোক সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া, তিনি অন্ধকারের সাহায্য করিতে যাইতেছেন, আর—তোমাদের এই পবিত্র কুলে বৃথা কালী দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তোমার ন্যায় কর্ম্মী, উৎসাহী ও উদার যুবক—যদি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে ভগবানের পৃথিবীতে আগমনই বৃথা। যাও মণিভদ্র যাও—এই পার্শ্ব দ্বারের চাবি লও, সম্মুখ দ্বার দিয়া যাওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা আছে,—ঐ মাঝের বারান্দার পার্শ্ব দিয়া—খিড়কির বাগানে নামিয়া, পূর্ব্বদিকের ছোট দ্বারের তালা খুলিয়া, যত শীঘ্র পার বাড়ীর বাহিরে যাও। এই কথা বলিতে বলিতে রমণী মণিভদ্রের হাত ধরিয়া, ঘরের বাহিরে ছাতের উপর লইয়া আসিল, সেখানে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সে রমণীর মুখখানি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া, মণিভদ্র হঠাৎ যেন

শিহরিয়া উঠিল, অকস্মাৎ তাহার দুই নয়নের কোণে দুইটি বারি বিন্দুও দেখা দিল, তখন কম্পিত স্বরে রমণীর দিকে চাহিয়া, মণিভদ্র বলিল, রমণীরত্ন! তুমি কে আমি চিনিয়াছি—তোমার এই ঋণ আমি কি দিয়া শুধিব? আমি চিনিয়াছি—তুমি মানবী নহ—তুমি দেবতা—জয় ভগবান্ শাক্যসিংহের জয়—দেবি! তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক আমি চলিলাম।

যাও মণিভদ্র যাও; যে পথে আনন্দ আছে, কিন্তু উদ্বেগ নাই, প্রীতি আছে, আকাঙ্ক্ষা নাই, যাও মণিভদ্র যাও, যে পথে জ্ঞান আছে, গর্ব্ব নাই আত্মোৎকর্ষ আছে —অভিমান নাই, যে পথে যাইলে নর অমর হয়, যে পথের পথিকের—জগতের দুঃখ দূর করাই একমাত্র ধর্ম্ম, যাও মণিভদ্র! সেই পথ দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রাবস্তীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিতেছেন, তুমি সেই পথের পথিক হও—আত্মাকে চরিতার্থ কর- জগতের দুঃখ মিটাই-বার জন্য- আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিবার জন্য—প্রস্তুত হও।

এই কথা বলিয়া, সেই রমণী মণিভদ্রের হাত ছাড়িয়া দিয়া, নিজেই পথ দেখাইবার জন্য সিঁড়ির পথ ধরিল, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, মণিভদ্রও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, ক্ষণকালের মধ্যেই উভয়েই নীচের তলায় আসিয়া, খিড়-কির বাগানে প্রবেশ করিল, বাগান হইতে বাহির হইবার দ্বারের কাছে আসিয়া, রমণী নিজেই চাবি দিয়া তালা খুলিল—ধীরে ধীরে কপাট দুইখানি খুলিয়া, রমণী দ্বারের

এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, বাহির হইবার পূর্ব্বে--- আর একবার বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে, রমণীর সেই —আলুলায়িতকুন্তল— বিমলবিস্তৃতনয়ন— প্রকৃতি-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া, মণিভদ্র কম্পিত স্বরে বলিল-- দেবি! তোমার আদেশ মস্তকে করিয়া, তোমারই নির্দ্দিষ্ট পথে পথিক হইবার জন্য চলিলাম। কিন্তু —দয়াময়ি! তোমার ঋণ আমি কি দিয়া শোধ করিব! আর একবার তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ যদি ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে, আর কি কখনও দেখা পাইব? বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসার বিস্ফারিত নেত্রে--রমণী মুখ তুলিয়া, এইবার মণিভদ্রের মুখের দিকে তাকাইল, এবং ধীরে ধীরে আবার চক্ষু নীচে নামাইয়া, অতি প্রশান্ত স্বরে অতি কোমলভাবে বলিল আবার দেখা? জানি না কবে কোথায় হইবে! তবে মনে হয়, হয়ত—আবার দেখা হইবে, এই বলিয়া, রমণী কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ফিরিল! তখন, মণিভদ্র খিড়কির দ্বার পার হইয়া, বাহিরের রাস্তায় পড়িল। একবার তাহার পিতার সেই বিশাল ও নিস্তব্ধ অট্টালিকার দিকে---আর একবার তখনও খিড়কির উন্মুক্ত কপাটের মধ্য দিয়া দৃশ্যমান-- দ্রুতগতিতে গৃহ প্রবেশোন্মুখ--সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী-মূর্ত্তির দিকে—চাহিয়া, কেমন একটা অস্ফুট স্বরে— একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মণিভদ্র ত্বরিতগতিতে জীর্ণ আম্রকাননের পথ ধরিল।

ধরা পড়িল।

মণিভদ্রকে বিদায় দিয়া, দ্রুতপাদবিক্ষেপে সেই রমণী খিড়কির বাগান পার হইয়া, বাগানে প্রবেশের দ্বার দিয়া যেমন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় কে যেন তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিল, চকিত হরিণীর ন্যায় —ভয় চঞ্চল বিশাল নেত্রে, সে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে পথে আলোক না থাকায়, সে কিছুই বুঝিতে পারিল না ও কিয়ৎকাল স্তব্ধের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে আবার কি ভাবিয়া, রমণী পশ্চাতে ফিরিল, আবার খিড়কির বাগানে আসিয়া পড়িল, সেইখানে উদয়োন্মুখ অরুণের অস্ফুট আলোকের সঙ্গে অস্তোন্মুখ শশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্না মিশিয়া, আরও একটু স্পষ্ট ভাবে দেখিবার সাহায্য করিতেছিল, বাগানে পা দিয়াই, সে খিড়কির দ্বারের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া দেখিল যে,—সে দ্বার বদ্ধ, ভিতরের দিক হইতে তাহার অর্গল বদ্ধ, নিশ্চয়ই বাটীর মধ্য হইতে, কোন ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহার সকল কার্য্যই দেখিয়াছে - এ কথা বুঝিতে তাহার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া, বুকে দুই হাত দিয়া, সে তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল।

এমন সময়ে হঠাৎ তাহার সম্মুখে,—আর একটী রমণী-মূর্ত্তি দেখা দিল, বসন্তের প্রথম মারুতহিল্লোলে পুষ্পভারাবনত মাধবীলতার ন্যায় ঈষৎ কম্পিতকলেবরা—সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সেই ষোড়শী রমণী হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া, অগ্রেই তাহার কাঁধে হাত খানি দোলাইয়া দিল এবং বুকের দিকে তাহাকে টানিয়া লইবার জন্য প্রয়াস করিতে করিতে বলিল, ভগিনি! বলিহারি তোমার সাহস! রত্নমালা তুমি যাহা করিয়াছ, আমি তাহা সবই দেখিয়াছি, ইচ্ছা করিলে, আমি তোমার কার্য্যে বাধাও দিতে পারিতাম. কিন্তু, তাহা দেই নাই, কেন যে দেই নাই—তাহা এখানে বলিব না, চল—এখন এখানে না থাকাই ভাল, পরিজনবর্গেরও জাগিবার সময় হইল, কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, আমাদের দুজনেরই বিপদের সম্ভাবনা আছে রত্নমালার চিনিতে বিলম্ব হইল না যে, সামন্তভদ্রের মধ্যম পুত্র সুভদ্রের পত্নী মণিমালিনী তাহার সহিত কথা কহিতেছে। সে একদিন মাত্র সামন্তভদ্রের বাটীতে আসিয়াছে বটে. কিন্তু, এই এক দিনেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মণিমালিনী তাহাকে ভাল বাসিয়াছে, তখন, কৃতজ্ঞতার পূত অশ্রুধারা রত্নমালার নেত্রে বহিতে লাগিল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে—গদগদ স্বরে, সে মণিমালিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দিদি! ক্ষমা করিও, ভাবিয়াছিলাম এ জগতে আর কাহাকেও আমার এই কার্য্য জানিতে দিব না, কিন্তু, ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ,—চল

দিদি! আমার শয়ন গৃহে, চল—সেখানে কেহ নাই, এখনি সকল কথাই তোমাকে বলিব। তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়া, আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে চাহি না।

সে কি ভগিনি! অবিশ্বাস কিসের! তোমার আর এখন কবিত্ব প্রকাশ করিতে হইবে না। আমি এখন চলিলাম। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে; এখন, আমার—তোমার সঙ্গে বসিয়া, নিভৃত আলাপ করিবার সময় নহে। বেলা দুই প্রহরের সময়, তুমি আমার শো'বার ঘরে আসিও, কেহ থাকিবে না, সেই সময় সব কথা শুনিব ও বলিব, যাও এখন নিজের শোবার ঘরে। আমি বাগানের দ্বার বন্ধ করিয়া উপরে চলিলাম। তখন, রত্নমালা ও মণিমালিনী একটু সতর্কভাবে—ধীরপদসঞ্চারে, নিজ নিজ শয়ন গৃহের দিকে যাত্রা করিল, রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল।

নগরে প্রবেশ।

আজ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রভাত—শ্রাবস্তীতে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। সহস্র ভিক্ষুপরিবৃত ভগবান্ শাক্যসিংহ বেলা এক প্রহরের সময় নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, বামে অনাথপিণ্ডিক, দক্ষিণে মণিভদ্র, পশ্চাতে শারীপুত্র, আনন্দ, মৌদ্গল্যায়ন ও সুভূতি প্রমুখ শ্রমণকবৃন্দ, মধ্যে প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্, ভিক্ষুর বেশ

—পীতবর্ণের উত্তরীয় ও অধোবাস, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, আর মুখে সর্ব্বদা সেই বিশ্ববিমোহন মৃদু হাস্যের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না! দেহের সৌন্দর্য্য আর মনের গাম্ভীর্য্য—দুইটীতে যেন এক হইয়া, শ্রাবস্তীর সেই বিশাল জনতাসাগরকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছিল. যে দেখে, সেই নত হয়, ভক্তির অতর্কিত উচ্ছ্বাসে তাহারই প্রাণ স্নিগ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠে! মুহুর্মুহুঃ লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি! সেই বিশাল জনতার জয়ধ্বনি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, শ্রাবস্তীর গৃহে গৃহে সেই উল্লাসময় জয়ধ্বনি ছড়াইয়া পড়িল, আর তাহার উল্লাসময় প্রতিধ্বনি সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সামন্তভদ্রের বিশাল প্রাসাদেই কেবল এই সুখের তরঙ্গ প্রবেশ করিল না। বৃদ্ধ সামন্তভদ্র প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মণিভদ্রের পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিবামাত্র—তাহার প্রাণের উপর যেন মুগুর পড়িতে লাগিল, সে তখন—অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল, কে এ কার্য্যে সাহায্য করিল? কাহার এমন দুঃসাহস হইল? এই ভাবনায় আর সে কুল কিনারা কিছুই করিতে পারিল না, কত রকম কথা উঠিতে লাগিল. কেহ বলিল যে, আকাশ হইতে শেষ রাত্রে একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব আসিয়া, মণিভদ্রকে কোলে করিয়া নিয়া গেল, ইহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তবে সেই সময় তাহার ঘুমের আবেশটা ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই। কেহ

বলিল, মণিভদ্র সামান্য ছেলে নহে, সে জাদু শিখিয়াছে, নহিলে, অমন করিয়া সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত কেন ? তার মার মৃত্যুর জন্য শোকটা ভাণ মাত্র। কেহ বলিল তাকি হয় ? সে কখনই পলাইতে পারে না, এ সব মিছা কথা, সে নিশ্চয়ই অন্ততঃ সেই ঘরের দেয়ালের মধ্যে লুকাইয়া আছে। সামন্তভদ্র এ সব কথায় কিন্তু, কাণও দিল না, সে বৃদ্ধ সে ব্যবহারনিপুণ, সুতরাং এই সকল আজগুবি কল্পনায় তাহার একেবারেই শ্রদ্ধা হইল না। সে ভাবিল—এ কার্য্য আমার বাটীর কোন লোকের সাহায্য ব্যতীত, কিছুতেই হইতেই পারে না কে সে লোক কেনই বা তাহার এত দুরন্ত সাহস ? আমি যদি বাটীর কর্ত্তা হইয়া, সেই আশ্রিত ও বিশ্বাসহন্তাকে চিনিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া না দিতে পারি, তবে আমার এ কর্তৃত্ব কিসের জন্য ?

তখন অনুসন্ধানের ধূম পড়িয়া গেল, যত দাস দাসী—সকলেরই একে একে এজাহার লওয়া হইল, কাহাকেও ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও মিষ্ট কথা শুনাইয়া, আবার, কাহাকেও বিশেষ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, কত প্রকারের অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কাজে কিন্তু, কিছুই হইল না, সকল অনুসন্ধানই ব্যর্থ হইল। এমন সময় বুদ্ধদেবের নগর প্রবেশের বিরাট বিজয়ধ্বনি তাহার কাণে পঁহুছিল। মণিভদ্র করজোড়ে—অবনতমস্তকে, শাক্যসিংহের নগর প্রবেশ মহোৎসবে যোগ দিয়াছে—এ কথা শুনিয়া, বৃদ্ধ —অভিমানী সামন্তভদ্র একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল,

পাপ করিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। নগরের সকল গৃহেই আনন্দসাগর উদ্বেল, তাহার গৃহ কিন্তু নীরব, কি যেন একটা গুরুতর ভয়! দুরন্ত-অভিমান ও বিষাদ---যেন তাহার বাটীর সকল ভাগকে ছাইয়া রহিয়াছে, সে গৃহে --যেন দিবালোকও ব্যাকুল হইয়া প্রবেশ করিতেছিল, সে কি হতভাগ্য! সে ছাড়া নগরের সকল লোকই সুখী, আর. তাহারই বা বিষের জ্বালায় এ অন্তর্দাহ কেন?

ব্যাপার দেখিয়া, বাটীর সকল লোকই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল. বাটীতে নূতন লোকের মধ্যে কেবল রত্নমালা ও তাহার মাতামহী দুই দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিল। তাহারা কিন্তু বড়ই সঙ্কোচে পড়িল। যাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল, তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহারা আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এক জন দাসী বলিয়া বসিল— ওই যে সুন্দর মেয়েটী—অশুভ চক্ষু, নিশ্চয়. উহার দ্বারাই এ সব হইয়াছে, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, রত্নমালা বড়ই চিন্তিত হইল, সে বড়ই বিপদে পড়িল, একমাত্র মণিমালিনী ছাড়া বাটীর আর সকলেই, তাহাকে আশঙ্কার চক্ষে দেখিতে লাগিল, এ সময়ে অন্যত্র চলিয়া যাইতে তাহার সাহস হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না, কিন্তু সামন্তভদ্রের বাটীতে বাস করাও যে, সে সময়, তাহাদের পক্ষে শুভকর নহে —ইহাও সে বুঝিতে পারিল তখন সে— অনেক কষ্টে, অনেক কৌশলে, মণিমালিনীর সঙ্গে আর এক বার নিভৃতে দেখা করিল—ও সব কথা সংক্ষেপে বুঝাইল,

মণিমালিনীও ভীত হইয়াছিল, তথাপিও, সে রত্নমালাকে সাহস দিল, ও বলিল যে, অদ্য দিনের বেলা তুমি যেন আমার ঘরে আসিও না, আমি যখন পারিব, একটা সময় করিয়া, তোমাকে ধরিয়া লইব, তুমি ভয় পাইও না।

এই কথা শুনিয়া, রত্নমালা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল; তাহার মনে আবার নানাপ্রকার বুদ্ধিও যোগাইতে লাগিল। সে মণিমালিনীর নিকট বিদায় লইয়া, মাতামহীর সঙ্গে যোগ দিল। সেই বিশাল অন্তঃপুরের এক নির্জ্জন প্রান্তে, বিরস বদনে ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটান—তাহার পক্ষে কিন্তু, বড়ই বিড়ম্বনাজনক হইয়া উঠিল।

পরিচয়।

মস্তকের উপর পূর্ণিমার চাঁদ—অমল ধবল জ্যোৎস্নায় জগৎ আলোকিত করিতেছে। মন্দ মন্দবাহী স্নিগ্ধ সমীরণ—মল্লিকা, বেলা ও কুটজ পুষ্পের সৌরভভার গবাক্ষের মধ্য দিয়া, কক্ষ মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত নরনারীর সুষুপ্তিময় শান্তিকে আরও জমাইয়া দিতেছে, সমস্ত দিনের উদ্বেগ, ভয়, শোক, ঔৎসুক্য ও পরিশ্রমে ক্লান্ত শ্রাবস্তী জ্যোৎস্নাজলে স্নান করিয়া, শুভ্রবসনা যোগিনীর ন্যায় যেন শান্তসমাধি অবলম্বন করিয়াছে, সকলের এই শান্তিময় সুষুপ্তির সময়ে—কেবল রত্নমালার

চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না, আশঙ্কায় ও আবেগে তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইতেছে, সে ধনী ও সম্ভ্রান্ত বণিকের কন্যা, তাহার পিতা বসুভূতি কৌশাম্বী নগরের একজন সমাজপতি, তাহার পিতার সে একমাত্র কন্যা, অল্প বয়সে তাহারও মাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল, কিন্তু, পাছে রত্নমালার কষ্ট হয়, এই জন্য বসুভূতি আর বিবাহও করে নাই। রত্নমালা তাহার পিতার এক মাত্র আদরের কন্যা, সে যখন যাহা চাহিত, সামর্থ্য থাকিলে, তাহার পিতা তাহাকে তাহা দিতে একক্ষণও বিলম্ব করিত না।

রত্নমালা ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখিয়াছিল, তখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ প্রচারিত না হইলেও, সে—শিক্ষা, কল্প ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদের অঙ্গগুলি পড়িয়া ছিল, নারী বলিয়া, সাক্ষাৎ বেদ না পড়িলেও বেদমূলক গ্রন্থ সকলের সরল ভাবার্থগুলি সে বুঝিতে পারিত।

ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থ পাঠের অবর্জ্জনীয় ফল—সংসার-বিরক্তি—তাহার অন্তঃকরণে দেখা দিয়াছিল, সে ষোড়শ-বর্ষীয় যুবতী হইয়াছে পিতা বসুভূতি তাহার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল, রত্নমালা কিন্তু, বিবাহ করিতে চাহে না, সে লজ্জা সম্ভ্রম ছাড়িয়া—অতি কাতর কণ্ঠে—অতি বিনয় সহকারে, তাহার পিতাকে নিজের এই অভি-প্রায় জানাইল শুনিয়া, তাহার পিতার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, নিজের এত ধন, এত সম্পদ—বংশের এত বড় মর্য্যাদা—এ সকল বিষয় অনেকবার অনেকভাবে

বুঝাইয়াও, সে রত্নমালাকে কিছুতেই সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না, সে বড়ই বিরক্ত হইল, উদ্বিগ্নও হইল তখন, কি একটা মনে মনে ঠিক করিয়া, সে রত্নমালাকে ও তাহার মাতামহীকে সঙ্গে করিয়া, তীর্থযাত্রা করিল, বারাণসী দেখিয়া, হিমালয়ের পাদপ্রান্তের তীর্থগুলি দেখিবার আশায়, সে যে পথ ধরিয়াছিল, সেই পথেই শ্রাবস্তী-নগর, সামন্তভদ্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাও ছিল, সুতরাং, সামন্তভদ্রের সাদর নিমন্ত্রণ এড়াইতে না পারিয়া, সে তাহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিল, হঠাৎ কৌশাম্বী হইতে কি একটা গুরুতর সংবাদ পৌঁছিল, বসুভূতি অগত্যা—সেই দিনই কৌশাম্বী যাত্রা করিল, কন্যা ও শাশুড়ী তাহার পুনরাগমনের কাল প্রতীক্ষায়—সম্ভ্রান্ত কুটুম্ব সামন্তভদ্রের অন্তঃপুরেই রহিল। আজ কিন্তু, সামন্তভদ্রের গৃহে বাস করা, রত্নমালার অসহ্য বোধ হইতেছে, তাই—রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরে শয়ন গৃহের মুক্ত গবাক্ষে বসিয়া, একমনে চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সে ভাবনার সমুদ্রে মধ্যে মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, আর—মধ্যে মধ্যে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া, শয়ন গৃহের অর্দ্ধোন্মুক্ত কপাটের দিকে চাহিতেছে, আশা—মণিমালিনী কখন আসিবে, কারণ, সন্ধ্যার সময়, যখন মণিমালিনীর সঙ্গে তাহার দেখা হয়, তখন, মণিমালিনী তাহাকে জানাইয়াছিল—যেমন করিয়া পারে, সে আজ তাহার সঙ্গে রাত্রিতে দেখা করিবে, সে যেন ঘরের কপাটে খিল না দিয়া, কেবল ভেজাইয়া

রাখে। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতেছিল, রত্নমালার মনের উদ্বেগও সেই সঙ্গে গভীরতর হইতেছিল। হঠাৎ শয়ন গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইল, ও সর্ব্বনাশ! একি? এ যে মণিমালিনী নহে! সভয়ে—উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে—রত্নমালা চাহিয়া দেখিল, একজন পুরুষ তাহার গৃহে প্রবেশ করিল, এবং ধীরপদসঞ্চারে—তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার সেই সভয়পদসঞ্চারে আরও ভয় পাইয়া, রত্নমালা দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ফিরিয়া, তাহাকে সম্মুখে করিয়া—উচ্চৈঃস্বরে কহিল, কে তুমি? সাবধান, আর অগ্রসর হইও না, আমি এখনিই লোক ডাকিব। তখন, সেই পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইল ও একবার যেন অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, বোধ হইল, যেন—সাহসে কুলাইল না, সে স্তব্ধের ন্যায় কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল। আরও একটু স্বর উচ্চ করিয়া, তখন রত্নমালা আবার বলিল—কে তুমি এখানে? তখন, কাতরকণ্ঠে অতি নীচস্বরে সেই পুরুষ বলিল, রত্নমালা রাগ করিও না, আমি মণিমালিনীর স্বামী!

তুমি মণিমালিনীর স্বামী সুভদ্র! এই গভীর রাত্রিতে তুমি এখানে কেন? তোমাকে কি মণিমালিনী পাঠাইয়াছে? আবার একটু থতমত খাইয়া, অপ্রস্তুত ভাবে সুভদ্র বলিল, এই ধরনা কেন—রত্নমালা! মণিমালিনীই আমাকে পাঠাইয়াছে।

ব্যাপার দেখিয়া, ভাব বুঝিয়া লইতে রত্নমালার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না।

ক্ষোভে, রোষে, লজ্জায় ও ঘৃণায়, তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তখন, পদাহত ফণিনীর ন্যায়, সে গর্জ্জিয়া উঠিল, ও আরও উচ্চস্বরে কহিল—মিথ্যা কথা কহিতেছ—মোহান্ধ যুবক! তুমি মণিমালিনীর স্বামী হইবার যোগ্য নহ, সুভদ্র এখনও বুঝ—কি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে তুমি উদ্যত হইয়াছ। যাও এখনই এই ঘর হইতে বাহির হও, নচেৎ আমি এই লোক ডাকিলাম। সুভদ্র তখন নরকের পথে আরও একটু অগ্রসর হইল, সে হাসিয়া বলিল সুন্দরি! মণিভদ্রকে চরিতার্থ করিবার জন্য এত প্রাণপণ! আর এ অধীনের প্রতি এত ঘৃণা! রত্নমালা, পায়ে ধরি, কেন এ অধমকে পায়ে ঠেলিতেছ?

ক্রোধে রত্নমালার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল সে নিজেই অগ্রসর হইয়া, শৃগালের সম্মুখে সিংহীর ন্যায়, সুভদ্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং অকম্পিতস্বরে বলিল, সামন্তভদ্রের কুলকলঙ্ক! কামান্ধ যুবক! বাহির হও ঘর থেকে, নহিলে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিব, বসুভূতির কন্যা—বিশ্বাসঘাতক কুটুম্ব পুত্রকে শিক্ষা দিবার শক্তি যদি না রাখিত, তাহা হইলে, কুটুম্বের গৃহে সে কখনই আশ্রয় গ্রহণ করিত না।

ব্যাপার দেখিয়া—সেই তেজস্বিনীর বহ্নিজ্বালাময় নয়নের রশ্মিচ্ছটায় প্রতিহত হইয়া—যেন সুভদ্রের কাম দেহটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে তখন—ধীরে ধীরে

ফিরিল এবং আস্তে আস্তে পা বাড়াইয়া, বাহিরের দিকে চলিতে লাগিল, তখন—হঠাৎ সেইরূপ উদ্ধত ভাব কমাইয়া, আর একটু ধীর স্বরে রত্নমালা বলিল—না সুভদ্র যাইও না, একটু দাঁড়াও; তুমি এখন আর—সে সুভদ্র নহ, সুতরাং তোমা হইতে আর ভয় নাই। শুন, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

রত্নমালার এই কথা শুনিয়া, সুভদ্র তখন দাঁড়াইল, কিন্তু, তাহার আর ফিরিতে সাহস হইল না। রত্নমালাই তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—এখন মণিমালিনী কোথায়? মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় সুভদ্র মস্তক নত করিয়াই রহিল এবং বলিল—আমি তাহাকে শয়ন গৃহে চাবি দিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিও, আমি এমন কার্য্য এ জীবনে আর করিব না।

বেশ কথা! ক্ষমা করিলাম, আর এক কথা এই যে, অদ্য রাত্রিতেই আমি অনাথপিণ্ডিকের বাটীতে যাহাতে যাইতে পারি, তুমি তাহার একটা বন্দোবস্ত করিতে পারিবে কি?

এবার সুভদ্র রত্নমালার মুখের দিকে চাহিল এবং দুই হাত যোড় করিল, তখন, তাহার দুই নয়নের প্রান্তে বারিবিন্দু দেখা দিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন তাহার বুক শূন্য করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, সে অতি কাতর স্বরে বলিল,—কৈ রত্নমালা! তুমি ত ক্ষমা করিলে না, তুমি বল ত এইক্ষণেই তোমাকে আমি অনাথপিণ্ডিকের বাটীতে

পাঠাইয়া দিব, কিন্তু, আমার এ দুঃখ জন্মেও মিটিবে না যে, রত্নমালার ন্যায় দেবীর নিকটে, অকপটে ক্ষমা চাহিয়া—এবং পাইব বলিয়া আশ্বস্ত হইয়াও, আমি তাহা পাইলাম না। রত্নমালা একটু লজ্জিত হইল এবং একটু ভাবিল, শেষে কহিল—আচ্ছা তাহাই হউক, আমি অদ্য অনাথ-পিণ্ডিকের গৃহে যাইব না, তুমি যাও, শীঘ্র মণিমালিনীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেও। আনন্দের বাষ্পে সুভদ্রের কণ্ঠ—গদ গদ হইয়া উঠিল। সে দুই হস্তে অঞ্জলি বাঁধিল এবং ভূমির দিকে তাকাইয়া কহিল, রত্নমালা! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমি বুঝিলাম—তোমার হৃদয় সত্য সত্যই ক্ষমাপূর্ণ, আমি চলিলাম, এখনিই মণি-মালিনী তোমার গৃহে আসিবে। এই কথা বলিয়া, আবার নমস্কার করিয়া, প্রায়শ্চিত্তপূত অনুশোচক পাপীর ন্যায়—প্রসাদ অথচ অবসাদজড়িত হৃদয়ে, সুভদ্র দ্রুতগতিতে রত্নমালার কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

সুভদ্রের বিদায়।

এদিকে সুভদ্রের মনটা অত্যন্ত বিগড়াইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি চাবি খুলিয়া, মণিমালিনীকে ঘর হইতে বাহিরে ডাকিয়া আনিল, পরে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজের অকার্য্যের পরিচয় দিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তাহাকে

রত্নমালার কাছে যাইতে অনুরোধ করিয়া, নিজে বিদায় হইল, কোথায় যাইবে সে তাহা বলিল না. কেবল কান্দিতে কান্দিতে কাতরকণ্ঠে মণিমালিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও জানাইল—"রত্নমালা বলিয়াছে যে, সুভদ্র মণি-মালিনীর অযোগ্য স্বামী, আবার যদি মণিমালিনি! কখন কোনদিন তোমার যোগ্য পতি বলিয়া, নিজেকে বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই ফিরিব, নচেৎ নহে।" এই কথা বলিয়া, সুভদ্র আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, দ্রুতগতিতে সে নীচে নামিয়া আসিল, মনে মনে গৃহ দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সে সামন্তভদ্রের গৃহ হইতে বাহির হইল। বাহিরে যাইবার সময়. বৃদ্ধ পিতার চিন্তাবিষণ্ণ মুখখানি একবার তাহার মানসনেত্রে উদিত হইল, সে কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার সেই আকর্ণবিস্তৃত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া. সেই তরুণ ও বিরক্ত হৃদয় সুভদ্র দ্রুতগতিতে অনাথপিণ্ডিকের বাটীর দিকে ধাবিত হইল। রাত্রি শেষ হয় নাই। তখনও চতুর্থ যামের আরম্ভসূচক মধুর-বংশীধ্বনি নগর তোরণের ঊর্দ্ধস্থিত কক্ষ হইতে উঠিয়া, প্রবোধোন্মুখ সুপ্ত শ্রাবস্তীর কর্ণে যেন অবসাদ মাখা সুধা লহরী ছড়াইয়া দিতেছিল।

দুইটী রমণী।

এদিকে কান্দিতে কান্দিতে মণিমালিনী রত্নমালার ঘরে আসিল, লজ্জায় মুখ দেখাইতে তাহার সাহস হইল না, অবনত বদনে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে, মণিমালিনী মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার স্বামী শরণাগত কুটুম্বকন্যার প্রতি—অবিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, পতিপ্রাণা মণিমালিনী এই কথা ভাবিয়া, লজ্জায় মুখ দেখাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিতে-ছিল, তাহার মুখে কথা সরিল না। রত্নমালা কিন্তু, প্রসন্ন বদনে আভ্যন্তরীণ সন্তোষের জ্যোৎস্নাময় হাসি ফুটাইয়া, আদরে মণিমালিনীর হাত ধরিল ও তাহাকে শয্যার উপর বসাইল দুই হাতে মণিমালিনীর অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে তখন—সেই জ্যোৎস্নাকোমলাঙ্গী রত্নমালা বলিল,—কেন তুমি কাঁদিতেছ ? কাল রাত্রিতে তুমিই ত আমাকে রক্ষা করিয়াছ, তোমার চক্ষের জল দেখিয়া, আমি কেমন করিয়া এ বাটীতে থাকিব ?

রত্নমালা ভগিনি ! তুমি দেবতা ! হতভাগিনীর স্বামীকে তুমি ক্ষমা করিয়াছ, তাঁহার হৃদয়কে তুমি পাপ পথ হইতে চিরকালের জন্য ফিরাইয়াছ, কিন্তু, ভগিনি ! আমার যে সর্ব্বনাশ হইল, তিনি কোথায় যাইলেন, তাহা বলিলেন না, কেবল যাইবার সময় এই মাত্র বলিয়া গিয়াছেন যে--

"যদি কোন দিন তোমার স্বামী হইবার যোগ্য হই, তাহা হইলে আবার ফিরিব!" রত্নমালা এ সংসারে আমি বড়ই হতভাগিনী, আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না—আমার বাঁচিয়া কি সুখ! এই কথা বলিতে বলিতে মণিমালিনী চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল, ক্রমে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

আদরে—তাহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে রত্নমালা—বলিল, মণিমালিনি! তুমি কেঁদ না, আমি বলিতেছি, বিশ্বাস কর, তোমার স্বামী আবার ফিরিয়া আসিবেন, তিনি যখন পাপের স্বরূপ বুঝিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন, তিনি পবিত্র ও জ্ঞানী হইয়া আবার গৃহে ফিরিবেন। শুধু তোমার কেন—জগতের বহুলোকের চক্ষের জল মুছাইতে,আবার তিনি এই সংসারে প্রবেশ করিবেন। ভগিনি! আমার কথা শুন, তুমি মিছা ভাবিয়া, ব্যাকুল হইও না। আমার আর সময় হইবে না, তোমাকে গুটীকতক কথা বলিবার জন্য আমি এ বাটীতে আছি, তুমি এখন স্থির হইয়া, তাহা শুন।

রত্নমালার সেই প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে, তাহার হৃদয় কতকটা যেন আশ্বস্ত হইল,সে কতকটা তখন প্রকৃতিস্থও হইল। তখন, রত্নমালা আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—ভগিনি মণিমালিনি! আমি তোমাদের বাটীতে আসার পর হইতেই—চারিদিক হইতে তোমাদিগকে বিপদ্ ঘেরিয়া ফেলিতেছে, সত্য সত্যই—আমি বড়ই হতভাগিনী, কাল

মণিভদ্রকে আমিই পলাইতে দিয়াছি, আজ তোমার স্বামীর অজ্ঞাতবাসেরও কারণ আমিই হইলাম। তোমাদের আশ্রয়ে আসিয়া, আমাকে তোমাদের সংসারের শেল হইতে হইল। ভগিনি! এ দুঃখ আমি সহিব কেমনে? কথা শুনিয়া, মণিমালিনী দুঃখিতও হইল, অথচ অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিতও হইল. সে আর এক-বার চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভগিনি! কিছু 'মনে করিও না, আমি কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি, তুমি কাল রাত্রিতে কেন এমন গুরুতর কার্য্যটা করিয়া বসিলে, আমি কিন্তু তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আরও প্রশান্ত ভাবে আরও—কোমল স্বরে রত্নমালা বলিল, সেই কথা বলিব বলিয়াইত আমি এতক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছি, আমি যে কথা বলিব, তাহা কিন্তু—তুমি আর কাহার কাছে বলিও না, সুভদ্রের কাছেও বলিও না। এই বলিয়া রত্নমালা মণিমালিনীর চক্ষের দিকে চাহিল, সে চাহনির ভাব বুঝিয়া লজ্জায়—মণিমালিনীর কপোলদ্বয় আরও লাল হইল, সে করজোড় করিয়া, কাতর কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, তখন রত্নমালা কিন্তু, তাহাতে বাধা দিল এবং বলিতে লাগিল—

তবে শুন মণিমালিনি! কেন আমি এই গুরুতর কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে—নানা কারণে আমি বিবাহ করিতে অসম্মত বলিয়া, পিতা আমার

প্রতি বিরক্ত ও বড়ই দুঃখিত, তীর্থযাত্রায় নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া, নানা ব্যবহার দেখিয়া, আমার লোক-চরিত্র জ্ঞান হইবে, তখন গৃহস্থ জীবন যে কত সুন্দর, তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমার এই মতি ফিরিবে, এই আশায়—পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া, তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। পিতার তীর্থযাত্রা বোধ হয় সফল হইবে। কেন তাহা বলি, কাল রাত্রিতে কিন্তু, ভগিনি! আমার সংকল্প বিচলিত হইয়াছে. আমি মনে করিতেছি বিবাহ করিব, যে কোন প্রকারে হউক না কেন, আমার পিতার মনের কষ্ট মিটান আমার কর্ত্তব্য—এ জ্ঞান আমি কাল রাত্রিতে পাইয়াছি।

মণিমালিনী নিস্তব্ধ ভাবে শুনিতেছিল। মধ্যে একবার কিছু ক্ষণের জন্য চুপ করিয়া, রত্নমালা কি ভাবিল, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, কাল রাত্রিতে তোমার ভাশুর রত্নভদ্র যখন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, আহা! সমস্ত-দিনের পরিশ্রান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও উদ্বেগ তাঁহার চৈতন্যকে লুপ্তপ্রায় করিয়াছিল। তিনি হাত পা ধুইয়া ঘরে যাইয়া বসিবামাত্র, তাঁহার পতিব্রতা পত্নী লীলা যখন মিছরির পানা আনিয়া তাঁহাকে পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন তোমার ভাশুর জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা ফিরিয়াছেন কি না? অত রাত্রিতেও বৃদ্ধ পিতা ফিরিয়া আসেন নাই শুনিয়া, তোমার ভাশুর আর সেই মিছরির পানা পান করিলেন না, পিতার শুষ্ক কণ্ঠে জলসেকের

পূর্ব্বে, তাহাঁর তৃষ্ণানল দগ্ধ নিজ কণ্ঠের তৃপ্তিসাধন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। আমি তখন সেই ঘরে ছিলাম, পিতার জন্য আত্মত্যাগ করিবার পবিত্র অভিপ্রায়—তখনিই আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি মনে মনে রত্নভদ্রকে গুরু বলিয়া নমস্কার করিলাম, তখনি মনে করিলাম যে, আমি পিতার কথা শুনিব এবং বিবাহও করিব। এই ভাবে মন বাঁধিয়া, আমি সেখান হইতে ফিরিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, যদি বিবাহই করিতে হয়—তবে দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়াই বিবাহ করিব। পরে—যখন মণিভদ্রের হাত ধরিয়া, তোমার স্বামী ও শ্বশুর উপরের ঘরে তাহাকে বদ্ধ করিবার জন্য সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন, তখন, আমি একবার তোমার দেবর মণিভদ্রকে দেখিয়াছিলাম। তাহার বিষাদমাখা গম্ভীর মুখখানি দেখিয়া, বড় আমার মনে কষ্ট হইল, ভগিনি মণিমালিনি! বলিতে কি—আমার বোধ হইল, যেন—মণিভদ্রের সহিত বিবাহ হইলে, আমাদের উভয়েরই ভাল হইবে। কিন্তু, আবার পরক্ষণেই ভাবিলাম, মণিভদ্র এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। কেন অসম্ভব? তাহাও বলি, কৌশাম্বীর প্রত্যেক বণিকের গৃহেই ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রশংসা প্রতিদিন ভক্তিভরে গীত হইয়া থাকে। আমার পিতা সম্প্রতি রাজগৃহে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তীর্থযাত্রার পূর্ব্বেই এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ভগবান্ শাক্যসিংহের চরণপ্রান্তে রাখিয়া আসিয়াছেন, এই ত গেল

আমাদের অবস্থা, আর এক দিকে, ভগবানকে অভ্যর্থনা করিয়া, মণিভদ্র জীবন কৃতার্থ করিয়াছে বলিয়া, তাহার পীড়ন হইল এবং সেই জন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আর আমি—সেই মণিভদ্রকে স্বামী করিয়া কৌশাম্বীর বণিককুলের মুখে কলঙ্ক দিব, ইহাত আর কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। এই সকল কথা ভাবিয়া, তখনই আমি স্থির করিলাম যে, মণিভদ্রকে আমি এই মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা প্রায়শ্চিত্ত হইতে উদ্ধার করিব।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহাত তুমি সকলই জান, মণিমালিনি! আমি বড়ই সাহসের কার্য্য করিয়াছি, আমার ন্যায় অকিঞ্চন স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা একেবারে অসাধ্য—তাহাই করিবার জন্য আমি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, জানিনা মণিমালিনি! এ ব্যাপারের শেষ কোথায়?

এতক্ষণ মণিমালিনী রত্নমালার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, আর তাহার কথাগুলি অতি উৎসুকভাবে শুনিতেছিল; এইবারে সে কথা কহিল, সে বলিল—রত্নমালা! আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে—নহিলে এমন হইবে কেন! শ্রাবস্তীর সকল লোক যাঁহাকে ভালবাসে—যাঁহার জন্য প্রাণপর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে চাহে, আমাদের শ্বশুর ঠাকুর—আর তাঁহার জনকয়েক আত্মীয়—তাঁহারই প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, কেন যে এ সুখের সংসারটীকে ছারেখারে দিতে বসিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? আর আমার স্বামী—এইবার মণিমালিনীর নয়ন প্রান্তে অশ্রু-

বিন্দু দেখা দিল, কেমন একটা বিষাদের সুব্যক্ত কালিমা তাহার মুখের সেই মনোহর কান্তিকে ম্লান করিল, আবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইল, পরক্ষণেই কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, সে আবার বলিতে লাগিল—আমার স্বামী, যাঁহার চরিত্র চিরদিন নিষ্কলঙ্ক, সেই আমার দেবচরিত্র স্বামী—আমার সর্ব্বস্ব—ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—কাল রাত্রিতে তিনি আমার হৃদয়ে যে দারুণ ক্লেশ দিয়াছেন, তাহাত তুমি জান রত্নমালা, তিনিও এ সংসার ছাড়িয়াছেন, হয় ত এ হতভাগিনীকেও তিনি এজন্মের মত ছাড়িয়াছেন, হায়! জানি না, কাহার দোষে তিনি এমন হইলেন! এই বলিয়া, মণিমালিনী দরদরিত অশ্রুধারাবর্ষণে নীরবে কান্দিতে লাগিল। তখন তাহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে, আর নিজের বিশাল অথচ আরক্ত নয়নপদ্মদুইটীকে অশ্রুধারায় সিক্ত করিতে করিতে—রত্নমালা বলিল, মণিমালিনি! বিধাতার কার্য্য আমরা কেমনে বুঝিব! তুমি অত ব্যাকুল হইও না, আমার মন যেন বলিতেছে—এ সকলই শেষে মঙ্গলময় হইবে।

এমন সময়—রত্নমালার কথা শেষ হইতে না হইতে—সামন্তভদ্রের বহির্বাটীতে একটা ভয়ানক কোলাহল উঠিল। ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিবার জন্য, রত্নমালা ও মণিমালিনী সম্মুখ বাটীর গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

সুভদ্র কি করিল ?

জেতবনের মধ্যে বিশাল দীর্ঘিকার পূর্ব্বপারে এক সুরম্য অট্টালিকায় ভগবান্ শাক্যসিংহ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বাস করিতেছেন। শ্রাবস্তীর রাজকুমার জিতসেন বহু অর্থ ব্যয়ে—অনেক বৎসরে এই জেতবন নামক বিচিত্র উদ্যান নিজের মনের মত করিয়া, নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই উদ্যানের মধ্যে কুবলয়বনমণ্ডিত—সুবিশাল—স্বচ্ছশীত-সলিলপূর্ণ- এক সুন্দর দীর্ঘিকা, তাহারই পূর্ব্বতীরে সেই মহেন্দ্রভবন তুল্য সুরম্য অট্টালিকা।

অনেক কষ্টে -প্রায় সহস্রগুণ অধিক মূল্য দিয়া, অনাথপিণ্ডিক কুমার জিতসেনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, সেই জেতবন নামক বিচিত্র উদ্যান ও অট্টালিকা সমস্তই ভগবানের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছিল। ভক্তের অকপট দান ভগবান্ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে, সেই জেতবনের বিচিত্র উদ্যান ও বিশাল অট্টালিকাটি বৌদ্ধবিহাররূপে পরিণত হইয়াছিল, অগণিত ভিক্ষুসঙ্ঘে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভগবান্ শাক্যসিংহ এখন জেতবনের সেই বিশাল বিহারেই বাস করিতেছিলেন। মণিভদ্রও এখন জেতবনেই বাস করিতেছে, তাহার নিতান্ত ইচ্ছা যে —সে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করে, ভগবানের প্রত্যেক উপদেশ তাহার হৃদয়ে শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায়

প্রবিষ্ট হইয়া, হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ ও আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মুখে আর সে বিষাদের ঘন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার নয়নে শান্তিময় মধুরভাব সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিতেছে, সে আর সংসারের কথা—আপনার কথা—একে বারও ভাবে না, তাহার সকল দুর্ভাবনা মিটিয়া গিয়াছে, বিশ্বজনীন প্রেমের ও বৈরাগ্যের কথা ভগবানের মুখে শুনিয়া শুনিয়া, সর্ব্বভূতকরুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ—ভগবানের অকপট ব্যবহারগুলিকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া রাখিয়া—সে এখন প্রকৃতপক্ষে একজন শান্ত ধীর ও চিন্তাশীল শ্রমণক হইয় উঠিয়াছে। সে এখন সেই জেতবনের বিশাল তোরণের এক প্রান্তে একখানি দ্বিতলের ক্ষুদ্রগৃহে বাস করিতেছে। সে ভিক্ষু হইতে একান্ত অভিলাষী হইলেও ভগবান্ তাহাকে ভিক্ষু হইতে আজ্ঞা দেন নাই।

সে প্রত্যহ ভগবানের চরণ দর্শন করিতে পায়। তাঁহার শ্রীমুখের সুধাময় উপদেশ শুনিয়া, আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পায়, সুতরাং, আপাততঃ ভিক্ষুসংঘে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই বলিয়া সে যে বিশেষ দুঃখিত, তাহা নহে, তবে, ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ না করিলে, পাছে কোন দিন ভগবানের সঙ্গ তাহাকে ছাড়িতে হয়—এই ভয়েই, সে প্রায়ই সংঘে প্রবেশ করিবার জন্য আগ্রহ করে। কিন্তু ভগবান্ তাহাকে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি—দিতেছেন না। কেন যে দিতেছেন না, তাহা কেহই জানে না।

এক কথায় বলিতে কি—তাহার জীবনে ভগবান্ শাক্য-সিংহের উপাসনা ছাড়া, অন্য কোন বস্তুই স্পৃহণীয় ছিল না, তাহার জীবন তখন শাক্যসিংহময় হইয়াছিল।

বেলা দুই প্রহর, প্রখর রৌদ্রের তাপে বাহিরে যায় কাহার সাধ্য? মণিভদ্র সেই নির্জ্জনগৃহে একাকী বসিয়া, গত রাত্রিতে নির্ব্বাণ ও মহাশূন্য বিষয়ে ভগবান্ যে গম্ভীর উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই একমনে ভাবিতেছে, এমন সময় কে বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া, ডাকিল —মণিভদ্র! মণিভদ্রের চিন্তাসাগর-মগ্ন-হৃদয়ে প্রথমে সে ডাক পৌঁছিলই না, একবার, দুইবার, তিনবার ডাকের পর তাহার চৈতন্য হইল, হঠাৎ যেন একটা পরিচিত অথচ অতর্কিত স্বর শুনিয়া, তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া দিল। কোন কথা না বলিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুভদ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, সুভদ্রের মুখখানি বিষণ্ণ, নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত, সর্ব্বাঙ্গে যেন কেহ বিষাদের গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে —মণিভদ্র দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল, কোন কথা না বলিয়া, নিকটে আসিয়া, সে তখন অবনত মস্তকে সুভদ্রের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। সে সময় তাহার দুই নয়নের কোণে দুইটী অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছিল।

দুইটী ভাই।

সুভদ্র একদৃষ্টিতে মণিভদ্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, মুখে একটীও কথা নাই, পাদতলে পড়িয়া, মণিভদ্রও চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছে। এইরূপে প্রায় এক দণ্ড কাল অতিবাহিত হইল, খানিকটা চক্ষের জল বাহির হইবার পর, মণিভদ্রের হৃদয় কতকটা লঘু বলিয়া বোধ হইল, সে তখন একবার সুভদ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পিতা কেমন আছেন? সুভদ্র এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল—এক্ষণে সে মণিভদ্রের সম্মুখে ভূমিতেই বসিয়া পড়িল, একবার শূন্য মনে উপরের দিকে চাহিয়া, সে ধীরে বলিল, মণিভদ্র! তুমি ত ভাই! আমাদের ছাড়িয়া আসিয়াছ, তবে কেন আর পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

"ভগবান্ জানেন—আমি কি সত্য সত্যই ছাড়িয়া আসিয়াছি? এ সংসারে থাকিয়া, এই সকল হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারা যায় না বলিয়াই ত, আমার একান্ত ইচ্ছা—আমি সঙ্ঘে প্রবেশ করি" এই কথা বলিতে বলিতে মণিভদ্রের চক্ষু দুইটি আবার জলে ভরিয়া আসিল, তখন সে কান্দিতে কান্দিতে ক্ষীণকণ্ঠে—কাতরস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল—বল দাদা বল, আমাদের বৃদ্ধ পিতা এখন কেমন আছেন? আমি যে দিন রাত্রিতে বাটী ছাড়িয়া

পলাইয়া আসি, সেই দিন শেষ বার যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন বোধ হইয়াছিল—যেন, তিনি ভাল নাই, তাঁহার মুখে বিষাদের গভীর কালিমা—শরীর নিতান্ত কৃশ—দুর্ভাবনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেন তাহার চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত পুড়িয়া যাইতেছিল। কেন দাদা! তিনি এমন হইয়াছেন? এখনও কি তিনি সেই রূপই আছেন?

মণিভদ্রের সারল্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, সুভদ্র একটু বিস্মিত হইল, সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, ভাই মণিভদ্র! পিতা যে কেন এমন হইয়াছেন—তাহা কি তুমি সত্য সত্যই এতদিন বুঝ নাই? তুমি কি জাননা—তোমারই জন্য পিতার এবং আমাদের এই দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে!

মণিভদ্রের মুখখানি আরও শুকাইয়া গেল, তখন, গভীর ভাবনাসমুদ্রের বাত্যাবিক্ষুব্ধ একটা প্রবল তরঙ্গের ন্যায় একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে—মণিভদ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্য তোমরা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ? আমার জন্য পিতৃদেব দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন! একথা ত আমাকে পূর্ব্বে তোমরা কেহই জানাও নাই; আমি অল্পবুদ্ধি—কই আমি ত এই বিষাদময় ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপারের কোন সন্ধানও পাই নাই?

বল দাদা! বল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমার দোষে আমার পিতার চক্ষুতে জল পড়িতেছে, তিনি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছেন, হা ভগবন্! এই কথা শুনিবার জন্যই

কি আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।” “সে কি ভাই মণিভদ্র! আমাদের বাটীতে এই যে প্রায় এক মাস কাল হইল, প্রত্যহ শ্রাবস্তীর গণ্য মান্য ব্রাহ্মণগণ যাওয়া আসা করিতেছেন—নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হইয়া, দিবা রাত্রি কত কি জল্পনা কল্পনা করিতেছেন—তাহা কি তুমি দেখ নাই? তুমি ত ভাই সর্ব্বদাই বাটীতেই থাকিতে। কেন আমাদের বাটীতে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে—ইহা জানিবার জন্য তুমি কি একবারও অনুসন্ধান কর নাই? ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! এই বলিয়া, সুভদ্র আর একবার তাহার কনিষ্ঠের সারল্যময় অথচ বিষাদপূর্ণ গম্ভীর মুখের প্রতি—তাহার অনুসন্ধিৎসু উজ্জ্বল নয়নদ্বয় প্রণিহিত করিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে অগ্রজের মুখের দিকে চাহিয়া, মণিভদ্র উত্তর করিল! “না দাদা, আমি এ সকল ব্যাপার ত কিছুই লক্ষ্য করি নাই! তুমি ত জান—যে দিন, এই হতভাগাকে আমাদের স্নেহময়ী জননী পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে—আমি এক দিনের জন্যও, আর বাহিরে আসিতাম না, যে গৃহে—সেই ভীষণ কাল-রাত্রিতে, জননী সেই স্নেহপূর্ণ সজল নয়নে আমার দিকে চাহিতে চাহিতে তাঁহার পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমি সেই গৃহটিতেই প্রায়ই কান্দিতে কান্দিতে দিন ও

রাত্রি অতিবাহিত করিতাম। জানিনা কেন সে দিন সন্ধ্যার সময় আমার বাহিরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল! আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাটীর বাহির হইলাম, বাহির হইবার সময়ে—আমাদের বাহিরের চত্বরে—একবার দেখিয়াছিলাম যে, অনেক গুলি ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত বৈশ্য মিলিয়া, বড়ই ব্যস্তভাবে কি লইয়া—একটা বাগ্বিতণ্ডা করিতে ছিলেন। আর সেই মহান্ জনসমূহের মধ্যে—আমার বৃদ্ধ পিতা উদ্বেগপূর্ণ নয়নে মাটীর দিকে তাকাইয়া, গালে হাত দিয়া, একমনে কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার সেই চিন্তাপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া, আমার একবার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার তাঁহার নিকট যাই, কিন্তু অত লোকের মধ্যে আমার যাওয়াটা সে অবস্থায় সঙ্গত কি না, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। কাজে কাজেই অন্যমনা হইয়া ভাবিতে ভাবিতে, আমি বাটীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা ত তোমরা সকলেই আমার মুখে সেদিন রাত্রিতেই শুনিয়াছিলে। সেই সকল কথা শুনিবার পরই কেন যে পিতার মুখ আরও বিষণ্ণ হইল, কেনই বা তিনি ক্রোধবশতঃ আমার মৃত্যুকামনা করিয়া, আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন? কেনই বা সেই উপরের ক্ষুদ্র গৃহে আমাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল? তাহা ত আমি এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই, যে দিন ভগবান্ প্রথমে এই জেতবনে প্রবেশ করিলেন, সেই দিন

আমি তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম, আমাদের পল্লার সেই বৃদ্ধ ধনঞ্জয় সেই সময় আমার দিকে চাহিয়া, পিতৃদেবের নাম লইয়া—কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, অমনি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের দিকে একবার চাহিয়া, ধনঞ্জয়কে নিষেধ করিল এবং বলিল ;—ধনঞ্জয় ! ওসকল নিষ্প্রয়োজনীয় কথা এ সময়ে বলা উচিত নহে। এখনিই ভিক্ষুপ্রবর মৌদ্‌গল্যায়ন ভগবানের নিকট পুনর্জ্জন্ম ও প্রাক্তন কর্ম্মবিষয়ে যে প্রশ্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ও যাহার উত্তর শুনিবার জন্য শ্রাবস্তীর শ্রাবকমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে বাধা দেওয়া কি উচিত ?

অনাথপিণ্ডিকের মুখে এই কথা শুনিয়া, আমার মনটা একবার কেমন ব্যাকুল হইয়াছিল, তখনই স্থির করিয়াছিলাম যে, সেদিনকার উপদেশ সমাপ্ত হইলে, আমি একবার নিভৃতে ধনঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং আমাদের সম্বন্ধে কি কথা সে কহিতেছিল, তাহা জিজ্ঞাসাও করিব, কিন্তু, সেদিনকার জন্মান্তর সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ এত মধুর ও সারবান্ হইয়াছিল যে, আমি উহা শুনিতে শুনিতে একেবারে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলাম—সেই বিশাল সভামণ্ডপে আমিই একাকী বসিয়া আছি, ভগবান্ উপদেশ শেষ করিয়া, কখন ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছেন—তাহা আমি জানিতেও পারি

নাই। যাক্, সেই অবধি যখনই আমার বাটার কথা মনে পড়ে—তখনই কি জানি কেন? প্রাণটা যেন অস্থির হইয়া উঠে। আমার বোধ হয়, আমাদের বাটীতে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আসিয়াছে, অনেক সময় ভাবিয়াছি, যাই একবার বাটীতে গিয়া—ব্যাপার কি তাহা বুঝিয়া আসি, কিন্তু যাইতে আমার সাহসে কুলায় না, তোমরা যদি আমাকে পাইয়া, আবার সেই রূপ আবদ্ধ করিয়া রাখ —আর যদি আমি ফিরিয়া আসিতে না পারি—ফিরিয়া আসিয়া আর যদি ভগবানের সেই পবিত্র মধুর বাণী কর্ণে শুনিতে না পাই, তাহা হইলে ওঃ সে কথা ভাবিতেও আমার প্রাণ অন্ধকার দেখে। যাক্ এই কারণে, কতবার যাইব যাইব করিয়াও, আমি বাটীতে ফিরিয়া যাইতে পারি নাই"। মণিভদ্রের কথাগুলি শুনিয়া, এতক্ষণে সুভদ্রের চমক ভাঙ্গিল, তাহার হৃদয়ের সন্দেহ অন্ধকার দূর হইল, প্রসাদ ও সন্তোষের স্নিগ্ধ রশ্মিমাখা—নেত্রের জ্যোৎস্নায় মণিভদ্রকে অভিষিক্ত করিতে করিতে, তখন সুভদ্র—একে একে সকল কথা মণিভদ্রকে জানাইল। তাহার পলায়নের পর ব্রাহ্মণগণের নিদারুণ পণ, ভগবানকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহাদের নানা প্রকার ষড়যন্ত্র—কিসে শ্রাবস্তী হইতে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়—তাহার জন্য নানা উপায়ের অনুষ্ঠান, এবং এই সকল বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও, বৃদ্ধ ধর্ম্মাত্মা সামন্তভদ্রের যোগদান ও নেতৃত্ব—এই সকল কথা বলিতে

বলিতে, সুভদ্র এক একবার নিজেই লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। সর্ব্ব শেষে, সুভদ্র—সেই রাত্রিতে রত্নমালার প্রতি, তাহার অন্যায় আচরণের উদ্যোগ—ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাপার গুলিও অকপট ভাবে কনিষ্ঠের নিকট জানাইল, সেই দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কাম ও ক্রোধের অগ্নিজ্বালাময় সংসার কাননে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ হইতে তাহার আর প্রবৃত্তি নাই, সে ভগবানের নিকট অভয় পাইলে, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিবে বলিয়াই, সেই খানে আসিয়াছে, এই কথাকয়টী মণিভদ্রের কাছে বলিবার সময়—তাহার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল, দরদরিত অশ্রুধারায় তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল, আবেগের অপ্রতিহত উচ্ছ্বাসে তাহার বাক্যও রুদ্ধপ্রায় হইল। মণিভদ্রও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, তাহার সেই আবেগ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তখন, সেই নিদাঘের মধ্যাহ্নে—প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ ভাবে সেই দারুণ রৌদ্রতাপের মধ্যে বসিয়া, পঞ্চতপার সমাধি অভ্যাস করিতেছিল! একটী পক্ষীও শব্দ করিতেছে না, পথে একটীও লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। সেই নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বসিয়া, তখন মণিভদ্র ও সুভদ্র—দুইটী ভাইতে মিলিয়া, বাহ্যপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির সেই দারুণ তাপের কথা ভয়ে ভয়ে ব্যক্ত করিতে লাগিল, তাহাদের

কাছে, সেই নিদাঘ মধ্যাহ্নের অনাবৃত রৌদ্রের সন্তাপও যে কত লঘু, তাহা—তাহাদের প্রাণের ব্যথার ব্যথী ছাড়া আর কে বুঝিবে ?

বিরোধ বাড়িল।

বৃদ্ধ সামন্তভদ্রের আনন্দের সংসার আজ ছারে খারে যাইতে বসিয়াছে, যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্য—সে প্রাণপণ করিয়া আসিতেছিল, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই নেতা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ক্ষমতাশালী নাগরিকগণ ক্রমেই তাহার উপর অধিকতর বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তাহার দুইটী পুত্র জেতবনে বুদ্ধদেবের শরণ লইয়াছে, কৌশাম্বীর বুদ্ধভক্ত—সুতরাং সনাতন ধর্ম্মদ্বেষ্টা অথচ ক্ষমতাশালী বৃদ্ধ বৈশ্যের কন্যা রত্নমালা সামন্তভদ্রের গৃহে পরম সমাদরে পালিত হইতেছে, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ বড়ই চটিয়া গেলেন, শেষে তাঁহারা জিদ্ করিয়া বসিলেন, যদি সামন্তভদ্র প্রকাশ্য সভায় তাহার দুই অশিষ্ট পুত্রকে ত্যাগ করে—এবং বসুভূতির কন্যা রত্নমালাকে তাহার বাটী হইতে বাহির করিয়া দেয়—তাহা হইলেই, তাহার সহিত ব্রাহ্মণগণের ও ব্রাহ্মণ পরিচালিত সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক ব্যবহার চলিবে, নহিলে, তাহাকেও অনাথপিণ্ডিকের ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া, সাধারণে ঘোষণা করিয়া দেওয়া

যাইবে। এই সকল ব্যাপার শুনিয়া, সামন্তভদ্রের বুক ভাঙ্গিয়া গেল—নিজের পুত্রদ্বয়কে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া, সমাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে, সে কোনরূপে স্বীকার করিল বটে, কিন্তু, সম্ভ্রান্ত কুটুম্বের কন্যা রত্নমালাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রস্তাবে, সে কোন মতেই সম্মত হইতে পারিল না। সে তখন একান্ত অনুনয় ও বিনয় করিয়া, ব্রাহ্মণমণ্ডলীর চরণপ্রান্তে কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া জানাইল যে, রত্নমালার পিতা যত দিন নিজে আসিয়া তাহাকে না লইয়া যান, সে পর্য্যন্ত, কিছুতেই সে রত্নমালাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, ব্রাহ্মণগণ অগত্যা শেষ প্রস্তাবটী ছাড়িয়া দিলেন। তখন স্থির হইল যে, আগামী কল্য নগরের গণ্য মান্য যাবৎ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া, সামন্তভদ্র একটী বিরাট সভার আহ্বান করিবেন ও সেই সভায় সকলের সমক্ষে, তাঁহার অশিষ্ট পুত্রদ্বয়—সুভদ্র ও মণিভদ্রকে ত্যাজ্যপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। সামন্তভদ্রের অগাধ ধন ভাণ্ডারের একটী মাত্র কপর্দ্দকও সুভদ্র বা মণিভদ্র—কেহই উত্তরাধিকারসূত্রে পাইবে না। সেই সভায় নেতার স্বরূপে শ্রাবস্তীর রাজকুমার জিতসেন স্বয়ং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, অধিকন্তু, ঐ সভায় ঘোষিত হইবে যে, শাক্যসিংহের অবস্থানে শ্রাবস্তীতে সনাতনধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত পড়িতেছে, অন্যায় ও অবৈধ আচরণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে—

সুতরাং, শ্রাবস্তী হইতে তাঁহাকে বল প্রয়োগ করিয়া, বিতাড়িত করিবার জন্য রাজার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন।

সামন্তভদ্রের বাটীর এই সকল ব্যাপার যথাসময়ে অনাথপিণ্ডিক, সুভদ্র ও মণিভদ্র প্রভৃতির শ্রুতিগোচর হইল, তাহারা তখন অত্যন্ত ভীত হইল, কি করিলে, এই অমঙ্গল ব্যাপার হইতে পিতাকে নিবৃত্ত করা যায়, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সুভদ্র ও মণিভদ্র সমস্ত রাত্রি চক্ষের পাতা না বুজিয়াই কাটাইয়া দিল; কিন্তু কোন পথই তাহারা খুজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

প্রাতঃকালে সুভদ্র ও মণিভদ্রের সঙ্গে, অনাথ-পিণ্ডিক ভগবানের চরণপ্রান্তে পৌছিয়া, কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে, এই সকল ব্যাপার নিবেদন করিল। মণিভদ্রের পলায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া, সামন্তভদ্রের গৃহের যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা একে একে বুঝাইয়া দিয়া, সুভদ্র করযোড়ে—অশ্রুসিক্ত নয়নে—ভগবানকে এই সময়ই শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল।

সকল কথা শুনিয়া, ভগবান্ শাক্যসিংহ একটু হাসি-লেন, সে হাসিতে আত্মনির্ভর ও নির্ভীকতার সঙ্গে মিশিয়া, যেন তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ গম্ভীরতাও প্রসন্নতার জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন—তাঁহার সেই গম্ভীর ও মধুর স্বরে, গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে করিতে, ভগবান্—অনাথপিণ্ডিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "অনাথপিণ্ডিক! আমি শুনিয়া সুখী হইলাম

যে, এত শীঘ্র—এই শ্রাবস্তীনগরে ধর্ম্ম ও সংঘের বিস্তার হইবার, এইরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নিরর্থক চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইও না, যাহা করিবার, তাহা, যথা সময়ে আমিই করিব। এই কথা বলিয়া, আর একবার সেই মধুর হাসির জ্যোৎস্নায় গৃহমণ্ডল আলোকিত করিয়া, ভগবান্ শাক্যসিংহ—প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য, জেতবনের কুসুমকাননে প্রবেশ করিলেন। সুভদ্র, মণিভদ্র ও অনাথপিণ্ডিক অবাক্ হইয়া,—পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা অতর্কিত ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়ের আবির্ভাবে, তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, শেষে সকলেই বিষণ্ন হৃদয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

আগুন জ্বলিল।

এদিকে প্রাতঃকাল হইতেই—সামন্তভদ্রের গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল। বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সুগঠিত উচ্চ মঞ্চের উপর—বিচিত্র বহুমূল্য চন্দ্রাতপের নীচে, রত্নরাজি-খচিত সুবর্ণসিংহাসন। দক্ষিণ ভাগে—সারি সারি বহুমূল্য আসন সমূহ—শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট, বামপার্শ্বে—নগরের সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ধনাঢ্যগণের বসিবার জন্য, বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত আসনরাজি সন্নিবেশিত। চারিপার্শ্বে অগণ্য

লোক পূর্ব্ব হইতেই সমবেত হইয়াছে। ক্রমে বেলা দেড় প্রহর অতীত হইল, চারিদিক হইতে—জনতার সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিয়া, সামন্তভদ্রের বিশাল প্রাসাদকে প্লাবিত করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর কোলাহল, বাহিরে, প্রাঙ্গণে ও অন্তঃপুরে—সর্ব্বত্রই জনতার ভীষণ সংমর্দ্দ, নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাগণ প্রায় সকলেই সামন্ত-ভদ্রের অন্তঃপুরে উপস্থিত। অন্তঃপুরের সম্মুখের বারান্দায়, গবাক্ষ-মালায় ও ছাদের উপরে—শ্রাবস্তীর অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি একাধারে সন্নিবেশিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। রত্নালঙ্কারের সমুজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত—সুন্দরীগণের কমনীয় বদনমণ্ডল, নানাবর্ণের কুসুমরেণু-রঞ্জিত বিশাল দীর্ঘিকার জলের উপর, বিকশিত—শত শত শতদলের অনুপমশ্রীকেও বিড়ম্বিত করিতে লাগিল।

ক্রমে যথাসময়ে বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত বিষয়ি-গণের মধ্যবর্ত্তী—শ্রাবস্তীর রাজ-পুত্র জিতসেন—এক সুবিশাল সুসজ্জিত-হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সামন্ত-ভদ্রের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কম্পিতচরণে—আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ে—জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নভদ্রের হাত ধরিয়া, বৃদ্ধ সামন্তভদ্র রাজপুত্রের অভ্যর্থনা করিল। তাহার মুখে বিষাদের গাঢ় কালিমা—যত্নকল্পিত হাস্যের আলোকে যেন আরও বিকট দেখাইতে লাগিল, রাজপুত্রকে সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইবার সময়, তাহার বুকের প্রত্যেক

পঞ্জরখানি যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও, সে তাহার নয়নপ্রান্তে কিছুতেই অশ্রুধারা সম্বরণ করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে সামন্তভদ্রের বিশাল তোরণ পার হইয়া, রাজপুত্র সদলবলে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ দিকের পণ্ডিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ছাড়া, সভাস্থ আর সকলেই প্রত্যুত্থান করিয়া, তাঁহার অভিবাদন করিল। তখন, তিনি করযোড়ে মস্তক অবনত করিয়া, সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাদের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই সুসজ্জিত বহুমূল্য স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সামন্তভদ্র ও তাহার পুত্র রত্নভদ্র—রাজপুত্রের নিকটে দক্ষিণপার্শ্বে—নীরবে মাটির দিকে মুখ করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সকলে একযোগে—উল্লাসভরে ও উচ্চস্বরে বলিল,—'জয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জয়' —'জয় যুবরাজ জিতসেনের জয়।' সেই সমবেত সহস্র সহস্র লোকের বিরাট জয়ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই জয়ধ্বনির সঙ্গে তুরী, ভেরী, দামামা প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র শঙ্খের গম্ভীর ও বিরাট ধ্বনি—শ্রাবস্তীর বিশাল রাজপ্রাসাদ হইতে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরটী পর্য্যন্ত আলোড়িত ও কম্পিত করিয়া তুলিল।

ক্রমে সেই মহতী সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সর্ব্বাগ্রে সামন্তভদ্রের পুরোহিত আচার্য্য জৈবলি দাঁড়াইয়া, বলিতে

আরম্ভ করিলেন।—তাঁহার বয়স প্রায় সপ্ততিবর্ষ, শুভ্র কেশ ও আনাভিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুরাজি—তাঁহার সেই বিশাল ও আরক্ত মুখমণ্ডলে—বিস্তৃত ও তেজস্বি নয়ন-দ্বয়, তাহা হইতে যেন প্রতি দৃষ্টিপাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। শ্রাবণের জলভরা মেঘের ন্যায় মহা-গম্ভীরস্বরে—সেই বিশাল জনতাসমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তপর্য্যন্ত উদ্বেলিত করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ—শ্রাবস্তীর সমবেত বেদমার্গনিরত ভদ্রগণ! তোমাদের পিতৃপিতামহগণের সাধের ধর্ম্মের প্রতি তোমরা এত বীতরাগ হইলে কেন? মনুষ্যের শুভাশুভ মনুষ্য বুঝিতে পারে না। মনুষ্যের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে রাগ ও দ্বেষের কলঙ্ককালিমা অপরিহার্য্য; তাই—আমাদের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষগণ—ধর্ম্মবিষয়ে, কোন দিন, কোন মনুষ্যের বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, অনাদিকাল হইতে প্রচলিত—অপৌরুষেয় বেদই—আমাদের একমাত্র ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের পথ বলিয়া দেয়। সেই বেদোদিত বিধি অনুসারে চলিতেছি বলিয়া, আমরা—এ জগতে অন্যান্য সকল মনুষ্যজাতির মধ্যে এত সম্মানভাজন!

আমাদের যজ্ঞ-ধূমের পবিত্র গন্ধ আঘ্রাণ করিবার জন্য, ইন্দ্রাদি দেবগণ—চির সুখময় স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, আমাদের তপস্যা ও মন্ত্রের প্রভাবে সিদ্ধ হয় না—এরূপ কি কার্য্য আছে? যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বশিষ্ঠ, বামদেব, কণ্ব, গৌতম, ব্যাস, পতঞ্জলি

ও জৈমিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ—বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কল্পসূত্র ও ধর্ম্মসংহিতার ন্যায়, অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারস্বরূপ রাশি রাশি গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়া, জগতের অজ্ঞানান্ধকারের বিনাশের উপায় প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; যে ধর্ম্মের বলে—মনু, মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অমরকীর্ত্তি সম্রাটগণ—শান্তি ও সন্তোষের কুসুম-শয্যায় সমগ্র ভূমণ্ডলকে সংস্থাপিত করিয়া, এই শোকতাপ ভরা ধরাধামকে অমর-বাঞ্ছিত কর্ম্মভূমিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। সেই পবিত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে দেখিয়াও, এপর্য্যন্ত—তোমরা কেহই বিচলিত হইতেছ না ? কে সে শাক্যসিংহ ? যাহার চরিত্র বেদ বিরুদ্ধ—যাহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান নাই, বৃদ্ধ পিতার কাতরোক্তিতে যাহার হৃদয় কম্পিত হয় না, অচিরপ্রসূতা পরিণীতা পত্নীর অশ্রুপ্রবাহে যাহার হৃদয়ে দয়া অঙ্কুরিত হয় না, তাহার মিষ্ট কথায় ভুলিয়া—রূপ দর্শনে আত্মহারা হইয়া—আজ তোমরা—তোমাদের সুখসম্পদের মূল, সুখময় গার্হস্থ্যের একমাত্র অবলম্বন, পরলোকের অদ্বিতীয় সম্বল, অপৌরুষেয় সনাতন ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছ ? ধিক্ তোমাদের বুদ্ধিকে ! আর ধিক্ তোমাদের হঠকারিতায় !

তখন সেই সপ্ততিবর্ষের বৃদ্ধ আচার্য্য জৈবলির কণ্ঠ-স্বর আরও উচ্চ হইতে লাগিল—সভার জনতাও ক্রমে

নিস্তব্ধ হইতে নিস্তব্ধতর হইল। রুদ্ধশ্বাসে—সেই দীপ্যমান ব্রাহ্মণের প্রদীপ্তভাষাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে, সকলেরই হৃদয়—এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার আবেগ অনুভব করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে প্রত্যেক শ্রোতার আরক্ত মুখমণ্ডলবিনিঃসৃত—সাধুবাদ ও বিজয়ধ্বনিতে, সেই অপার ও অপরিসীম জনতাসমুদ্র—যেন ধীরে ধীরে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

ক্রমে সেই গম্ভীর স্বর সপ্তমে তুলিয়া, আচার্য্য জৈবলি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—যজ্ঞপতি ইন্দ্র তোমাদের হৃদয়ে শত বজ্রের বল প্রদান করিবেন—তোমাদের দেবপ্রতিম পূর্ব্বপুরুষগণের চিরবাঞ্ছিত ধর্ম্মের অবমন্তা—শাক্যসিংহকে নগর হইতে বিদূরিত কর। সনাতন ধর্ম্মের জয় হউক, নাস্তিকতা—চিরদিনের জন্য শ্রাবস্তীর পবিত্র ভূমিকে পরিত্যাগ করুক। ধর্ম্ম আমাদের চির সহায়—ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া চল, আমরা এই অধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করি, বল—জয় সনাতন ধর্ম্মের জয়। তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকল ব্যক্তিই একই সময়ে একই স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় সনাতন ধর্ম্মের জয়! সেই সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত জয়—জয়ধ্বনিতে, সমগ্র শ্রাবস্তী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সভার লোক সকলও যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, সকলেই যেন সেই উদ্দীপনাময় বক্তৃতামদিরার বিক্ষোভকারী মদে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইল, তখনই জেতবনে গিয়া, শাক্যসিংহকে বলপূর্ব্বক

নগর হইতে তাড়াইবার জন্য, যেন তাহারা অধীর হইয়া উঠিল। তখন সেই বিশাল জনতা—প্রলয়ের উত্তাল কল্লোলমালায় উদ্বেল মহাসাগরের ন্যায়, অব্যক্ত ভীম-গর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিল।

এমন সময়—অকস্মাৎ বাহির হইতে একটা বিরাট কোলাহল উঠিল, ক্রমে সে কোলাহল এত বাড়িতে লাগিল যে, বাহিরে কি হইতেছে তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, ভিতরের সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সভার কার্য্যে বড়ই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কি হইল কি হইল—বলিয়া, জানিবার জন্য সকলেই বাহিরের দিকে ফিরিল। ক্রমে কোলাহল—আরও নিকটবর্ত্তী হইল, আরও বিস্পষ্টভাব ধারণ করিল, বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল যে, সেই সুবিশাল ভীষণ জনতাসমুদ্রকে আমূল আলোড়িত করিয়া—বাহির হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে মিলিত স্বরে—শব্দ উঠিতেছে,—জয় ভগবান্ শাক্য-সিংহের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়! জয় ধর্ম্মসঙ্ঘের জয়! কি ব্যাপার তাহা কেহই বুঝিল না, আর সভার নিয়মও চলিল না। উদ্বেগে, বিস্ময়ে ও ক্রোধে—কাঁপিতে কাঁপিতে, একটা লম্বমান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া—আচার্য্য জৈবলি, হা অদৃষ্ট বলিয়া, অগত্যা নিজ আসনে বসিয়া পড়িলেন।

অপূর্ব্ব প্রতিবিধান।

তখন সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, বিস্মিত নেত্রে—বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—সত্য সত্যই ভগবান্ বুদ্ধদেব সেই বিচিত্র সভামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সেই প্রশান্ত অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডল, আর সেই আকর্ণবিস্তৃত উজ্জ্বল নয়নযুগল, প্রসাদ ও উদারতা মাখা সেই বিশ্ববিমোহন জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি! যে দিকে সে নেত্র ফিরিতেছিল, সেই দিকেই যেন নীলেন্দীবরমালা ছড়াইয়া দিতেছিল, আর সেই ভয়শূন্য—স্নেহমাখা বদনে মধুর মৃদুমন্দস্মিত! যেন শরতের শান্ত জ্যোৎস্না গঙ্গাসৈকতে প্রতিফলিত হইতেছিল! কি সম্ভাবসৌম্য অথচ গম্ভীর মূর্ত্তি! যে দেখিতেছে, তাহারই হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন শীতল হইয়া যাইতেছে! তাঁহার সেই কুসুমসুকুমার অথচ মহানুভাব—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় কমনীয় দেহ—যে দেহ দেখিয়া কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ হয়, সেই দেহে না আছে দিব্য বস্ত্র—না আছে বহুমূল্য রত্নাভরণ, পীতবর্ণের একখানি অধোবাস, আর একখানি উত্তরীয়, হস্তে সামান্য ভিক্ষা পাত্র। সেই অপূর্ব্ব বেশ! সেই অমানুষ অনুভাব! আর সেই ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখিয়া, সভার সমস্ত লোকই বিস্মিত ও স্তব্ধপ্রায় হইল। তিনি যে দিকে যাইতেছেন, সেই দিকেই লোকে আগ্রহের সহিত মস্তক

অবনত করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত, সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল, কেবল আচার্য্য জৈবলিপ্রমুখ জনকয়েক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—রোষে, ক্ষোভে ও অভিমানে—কাঁপিতে কাঁপিতে, দ্রুতপদবিক্ষেপে কাহারও অপেক্ষা না করিয়া —কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সভাস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় ভগবান্ শাক্যসিংহ প্রশান্তগম্ভীরভাবে একবার সভার চারিদিকে চাহিলেন, চারিদিক হইতেই অমনি সহস্র কণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি হইল, সকলেই অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। তখন তিনি ধীরপদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়া, সেই বিচিত্র ধ্বজপতাকাশোভিত রমণীয় মঞ্চের উপর নিজেই উঠিলেন। তাঁহাকে মঞ্চের উপর উঠিতে দেখিয়া, মঞ্চস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এক সঙ্গে দণ্ডায়মান হইলেন, রাজকুমার জিতসেনও সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, আনত মস্তকে অগ্রে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে—ধ্বনি হইল 'জয় বুদ্ধের জয়!'

তখন সেই মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, সভার দিকে সম্মুখ করিয়া,—সেই বিস্মিত ও স্তব্ধ জনসমূহকে লক্ষ্য করিয়া, ভগবান শাক্যসিংহ—তাঁহার সেই স্বতঃসিদ্ধ, অপার্থিব, প্রশান্ত, গম্ভীর ও মধুর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

হে শ্রাবস্তীর নাগরিক বৃন্দ! তোমরা জীবনে কত কার্য্য করিয়াছ, কত সদুপদেশ শুনিয়াছ, কত রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়াছ, কত মন্দির—কত চৈত্য—কত প্রপা—কত সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, সেই সকল সৎকার্য্য—তোমাদিগকে আত্মাভিমানের বৃশ্চিক দংশন হইতে ক্ষণকালের জন্যও কি রক্ষা করিতে পারিয়াছে? ভাবিয়া দেখ দেখি, এই সংসারের—বিবাদ, কলহ, চৌর্য্য, দস্যুতা, রোগ, শোক ও মোহ—এই সকল অনর্থের—মূল কি?—ঐ আত্মাভিমানই কি ইহাদের মূল নহে? নির্ব্বাণের শান্তিময় মহাসমুদ্রে একবারমাত্র অবগাহন করিলে—এই সকল দুঃখের মূল আত্মাভিমান কিন্তু চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়। সেই নির্ব্বাণের শান্তসত্তা ক্ষণকালের জন্য তোমরা কেহ অনুভব করিতে পারিয়াছ কি? আমি তোমাদের জন্য—সেই নির্ব্বাণ লাভের মহাপথ আবিষ্কার করিয়াছি। এই আত্মম্ভরিতা বা আত্মাভিমানই তোমাদের সকল দুঃখের মূল, এই মূলের উচ্ছেদ করিতে পারিলেই, মানব চিরশান্তিলাভের অধিকারী হইতে পারে, ইহা ছাড়া—সংসারে সকল দুঃখ মিটাইবার অন্য কোন উপায় নাই। সুখের সংসার ছাড়িয়া, বিরহক্লিষ্ট পিতার চক্ষুর জলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নবপ্রসূতা মদেকজীবিতা পত্নীর কাতর ক্রন্দনধ্বনির প্রতি ক্ষণকালের জন্যও অপেক্ষা না করিয়া, সুসমৃদ্ধ—সুপ্রতিষ্ঠিত—পুরুষক্রমাগত রাজ্যের প্রতি দৃক্‌পাতও

না করিয়া—অশন, বসন, ভূষণ, শয্যা, গৃহ, সম্পদ্ ও সুহৃদের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া—বহু বর্ষব্যাপি তপস্যা ও সমাধির প্রসাদে, আমি এই দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই তোমাদের দ্বারে দ্বারে বিলাইবার জন্য—আজ আমার এই ভিক্ষুবেশ! এস জগতের তাপদগ্ধ জীবগণ! নির্ব্বাণের পবিত্র শান্তিময় সাম্রাজ্যের প্রশস্ত দ্বার তোমাদের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই দ্বারে যে প্রবেশ করিবে, সে সদ্যঃ সকল দুঃখের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এস এ পথে তোমরা ভ্রান্ত জীব! এ পথ—পরের জন্য আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর পথ! এ পথে জাতিভেদের দৃঢ় বন্ধন নাই—এ পথে আশ্রমভেদের কঠোরতা নাই—এবং অধিকারভেদের নৈরাশ্যপ্রদ বৈষম্যও নাই। এ পথের যে পথিক, তাহাকে তীব্র তপস্যা করিতে হইবে না, কোন দেবতার নিকট কাতরভাবে দয়া ভিক্ষা করিতেও হইবে না, এ পথে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবই এক—সকলেই সকলের ভাই ভাই। এস শ্রাবস্তীর নাগরিক বৃন্দ! আমার কথায় বিশ্বাস-স্থাপন কর।—যাহা দেবতার দুর্লভ—যাহা ঋষির অপ্রাপ্য—যাহা মুনির অগম্য, সেই বুদ্ধত্ব আমি পাইয়াছি, সেই দেবদুর্লভ ঋষিবাঞ্ছিত ও মুনিজনের অভিলষিত বুদ্ধত্ব অকাতরে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে বিলাইবার জন্য, আমি তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে বেড়াইতেছি, এস এস সংসার-তাপক্লিষ্ট বিবেকহীন মানব! তোমাদের

মরণের ভয় দূর করিবার মহামন্ত্র আমি অকাতরে বিলাইতেছি। তোমরা দেখিবে—এ জগৎ তোমাদের মিত্রে ভরা! কেহই তোমাদের শত্রু থাকিবে না। বিশ্বজনীন প্রেমই মানবের শান্তিলাভের একমাত্র কুসুমাবৃত পথ—এই অখণ্ডনীয় সত্যটীকে তোমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত কর। বুদ্ধের কথায় বিশ্বাস কর—দেখিবে, তোমাদের সকল দুঃখ—সকল তাপ সদ্যঃ মিটিয়া যাইবে। এই মহাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ, ইহার ফলও প্রত্যক্ষ! কালান্তরে ফল পাইবার আশ্বাসে এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না—তাই বলি, এস মানব! অহঙ্কারে, অভিমানে, ক্রোধে, লোভে, মোহে ও কামে—বিকলেন্দ্রিয় স্বার্থান্ধ ভ্রান্ত জীব! এস—এই প্রেমময়, শান্তিময় ও বিবেকময় মহাপথে এস! তোমার অহঙ্কার মিটিবে—অভিমান ভাসিয়া যাইবে—ক্রোধ শান্ত হইবে—লোভ দূরে পলাইবে—মোহ ছিন্ন হইবে—কাম দগ্ধ হইয়া যাইবে। এস জীব! এস—সেই শান্ত, গম্ভীর ও প্রসন্ন নির্ব্বাণের পথ দেখাইবার জন্য আমি তোমাদের দ্বারে ভিক্ষার্থী। অবজ্ঞা করিয়া, নিজ নিজ দুঃখের পথকে আর বৃথা প্রশস্ত করিও না।"

এই কথা বলিয়া, ভগবান শাক্যসিংহ সকল লোকের দিকে আবার সেই মৃদুহাস্যপূত প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহার সেই অমৃতমধুর উপদেশ শুনিয়া—লোক সকলের হৃদয়—কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তির রসে সিক্ত হইয়া আসিল ও তাহাদের আত্মাভিমান দূরে

যাইল, সেই প্রশান্ত গম্ভীর বদন বিনিঃসৃত—অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে যেন—তাহারা সে সময়ের জন্য, সংসারের সব কথাই ভুলিয়া গেল।

তখন শ্রাবস্তীর রাজকুমার জিতসেন—বৃদ্ধ সামন্তভদ্রের হাত ধরিয়া, ধীরে সলজ্জ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন ও ভগবানের চরণোপান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। অশ্রুসিক্ত-নয়নে গদ্গদ স্বরে—রাজকুমার জিতসেন বলিলেন,—ভগবন্ এই দাসবর্গের অজ্ঞানকৃত প্রথম অপরাধ ক্ষমা করুন, আজি হইতে আমরা আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব, এই শ্রাবস্তী নগরে আর কেহ আপনার প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্ম বা সঙ্ঘের কোন প্রকার বিরোধাচরণ করিবে না, অনাথনাথ! পতিতপাবন! আপনারই ইচ্ছা সফল হউক।

বৃদ্ধ সামন্তভদ্র তখন, দুই হস্তে ভগবানের দুই চরণ ধরিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল—

বল দেব! বল আমায় ক্ষমা করিলে! এমন দয়াল না হইলে লোকে তোমায় ভগবান্ বলিবে কেন? যে তোমার শত্রু—তোমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে ক্ষণ মাত্রও যাহার জিহ্বা বিরত নহে, সেই অধঃপতিত অধমকে তুমি যদি—নাথ! এমনি ভাবে দয়া করিয়া উদ্ধার না করিবে, তবে তোমার নাম শুনিয়া, মানব কেন ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিবে? কেনই বা তাহাদের হৃদয়ের সিংহাসনে তোমার পবিত্র প্রতিমা স্থাপন করিয়া, তাহার সম্মুখে—দম্ভ,

মান ও মোহের বলিদান না করিবে! ভগবন্! আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম। আমার কুল—আমার গৃহ—আমার যাহা কিছু, তাহা সকলই আজ পবিত্র হইল।

ক্রমে সভার ভাব একেবারে ফিরিয়া গেল। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—সকলেই করজোড়ে অবনত মস্তকে সেই মহাপুরুষের স্তুতি করিতে লাগিল। প্রাসাদের উপরিতল হইতে মুহুর্মুহুঃ পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। পবিত্র ও গম্ভীর শত শত শঙ্খধ্বনিতে মিশিয়া সহস্র সহস্র মুখোচ্চারিত শাক্যসিংহের জয়শব্দে—দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল।

তখন আশ্বাস বাক্যে সকলকে আশ্বাসিত করিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে ও সমুজ্জ্বল মধুর মন্দহাস্যে সেই বিস্মিত ও ভক্ত জনতার হৃদয়ে আশা ও শান্তির জ্যোৎস্না বিকশিত করিয়া, ভগবান বুদ্ধদেব—ধীরে ধীরে পদব্রজে আবার জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন পুত্র-মুখ-দর্শন-লোলুপ আনন্দবিহ্বল বৃদ্ধ সামন্তভদ্র ও রাজকুমার জিতসেন—বহু গণ্য মান্য লোকের সঙ্গে, ভগবানের অনুসরণ করিলেন।

রত্নমালা কোথায়?

পর দিন প্রাতঃকালে রত্নমালার পিতা বসুভূতি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিল, আসিয়াই দ্বারদেশের চত্বরে উপবিষ্ট সামন্তভদ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, সাক্ষাৎ হওয়ার পর কিন্তু, সে যাহা শুনিল—তাহাতে তাহার

মাথায় বজ্রাঘাত হইল, সে শুনিল,—গত রাত্রিতে তাহার কন্যা রত্নমালা কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু, কেহই তাহার কোন সন্ধান দিতে পারে নাই। বৃদ্ধ সামন্তভদ্র—বাল্যবন্ধু বসুভূতির নিকট এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে, অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আর বসুভূতি—তাহার বৃদ্ধ বয়সের এক মাত্র নয়ন-তারা—সেই রত্নমালার এই অনুচিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া, শোকে, ক্ষোভে ও ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক আত্মীয়ের বাটীতে পৃথক্ লোক পাঠান হইয়াছে, কোন স্থানেই কিন্তু, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। রত্নমালার মাতামহী কেবল কান্দিতেছে—কেন গেল ? কোথায় গেল ? কিরূপেই বা গেল ? ইহার বিন্দুবিসর্গও সে কিছুই জানে না, রত্ন-মালার মহার্ঘ ভূষণরাজি—তাহার বড় সাধের পুস্তকগুলি —সকলই পূর্ব্বের ন্যায় যথা স্থানে পড়িয়া আছে। গত কল্য রাত্রিতে ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন সামন্তভদ্রের বাটী পরিত্যাগ করেন, সেই সময় হইতে, প্রায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত—তাহার বাটীতে যে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ উৎসব দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাটী ফিরিয়া যাইবার তাড়াতাড়িতে—একটা বিষম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ হইয়াছিল। অমুকের বাটীর শিবিকার বাহকগণকে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না—অমুকের বাটীর

গোযানের একটা বলদ কোথায় দৌড়াইয়া গিয়াছে—কে খোজ করিয়া ধরিয়া আনে? শ্রেষ্ঠিচত্বরের কোটি-পতি বণিকের পরিবারগণের অগ্রে যাওয়া দরকার—সুতরাং, মধ্য পল্লীর গৃহস্থের বাটীর স্ত্রীলোকদের এখনও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে—তাহাদের নিজের বাটীর গোযান বা শিবিকা নাই। এই সকল ব্যাপার লইয়া, প্রায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত সামন্তভদ্রের বাটীতে বড়ই বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল হইতেছিল। সেই কারণে, কে কোথায় আছে—কে কোথায় গেল বা রহিল—তাহার খোজ খবর লওয়া, এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, হয় ত, কোন সম্ভ্রান্তমহিলার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ও ভাল-বাসা থাকায়, রত্নমালা—তাঁহার সহিত শিবিকায় বা গো-শকটে আরোহণ করিয়া, গত রাত্রিতে তাঁহাদেরই বাটীতে গিয়া থাকিবে। যাইবার সময়—চারিদিকে গোলমালে কাহাকেও সম্মুখে না দেখিতে পাওয়ায়, কাহাকে কিছু না বলিয়াই হয় ত চলিয়া গিয়াছে। অদ্য সন্ধ্যার মধ্যে সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। এই প্রকার আশা—তখনও অনেকেরই মনে জাগিতেছিল। এদিকে—মণিভদ্র গত রাত্রিতেই তাহার পিতার সহিত বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, রত্নমালার অনুসন্ধান করিবার জন্য, সে সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। অকৃত মনোরথ—সুতরাং বিষণ্ণবদন হইয়া, সন্ধ্যাকালে সে বাটীতে ফিরিয়া আসিল। রত্নমালাকে দেখিবার জন্য তাহার ও নিতান্ত ব্যাকুলতা হইয়াছিল, সে

কিন্তু সকলকেই বলিতেছিল যে, রত্নমালা নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়াছে, তাহার ন্যায় সাধুস্বভাব স্ত্রীলোকের পক্ষে, কোনপ্রকার দুর্বিনয় আশঙ্কা করিলেও পাপ হয়—ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস।

এই প্রকার নানা গোলযোগ ও কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল, এমন সময়, অনাথপিণ্ডকের বাটী হইতে একজন পত্রবাহক—সামন্তভদ্রের হস্তে একখানি পত্র আনিয়া দিল। তাড়াতাড়ি পত্রখানি পড়িয়া, সামন্তভদ্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, তখন বসুভূতিকে আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দাশ্রু বারিতে তাহাকে আপ্লুত করিতে করিতে, সে অনাথপিণ্ডিকের সেই পত্রখানি শুনাইল। পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয় ভ্রাতঃ সামন্তভদ্র !

আমাদের সকলেরই আত্মীয় বসুভূতির কন্যা রত্নমালা—কল্য রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়, শ্রেষ্ঠিচত্বরের সুবর্ণ গুপ্তের বাটীর শিবিকায় আরোহণ করিয়া, তাহারই পরিচারিকার সঙ্গে আমার বাটীতে আসিয়াছে, সে কেন আসিয়াছে ? এবং কেনই বা হঠাৎ তোমার গৃহ অজ্ঞাতভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে ? তাহার কারণ—সে আমার নিকটে প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহার অভিপ্রায় যে, তাহার পিতার আগমনকাল পর্য্যন্ত, সে আমারই বাটীতে থাকে। আমি, গত কল্য সন্ধ্যার পর হইতে অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, ভগবানের সেবার জন্য জেতবনেই ব্যাপৃত ছিলাম, এই কারণে, যথা সময়ে. এ সংবাদ তোমাকে জানাইতে

পারি নাই। রত্নমালার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তাহার মাতামহীও এই খানে আসিয়া, তাহার সহিত বাস করেন। ইতি। অনাথপিণ্ডিক।

পুনশ্চ—

এই পত্রের সহিত রত্নমালার স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র পাঠাইলাম, সুভদ্রের পত্নী মণিমালিনীর জন্য এই পত্রখানি লিখিত হইয়াছে। ইতি।

পত্রার্থ অবগত হইয়া বসুভূতির দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। সেই রাত্রিতেই রত্নমালাকে দেখিবার জন্য বসুভূতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। মণিভদ্রের চিন্তামলিন গম্ভীর বদনে ক্ষণকালের জন্য, উল্লাসের স্মিত-জ্যোৎস্না আবার ফুটিয়া উঠিল।

রত্নমালার পত্র।

ভগিনি মণিমালিনি!—

আসিবার সময় তোমাকে না জানাইয়াই চলিয়া আসিয়াছি—সে জন্য, আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই অপরাধ করিয়াছি, দুঃখিনী রত্নমালার অপরাধ তোমরা কি ক্ষমা করিবে?—অপরে কি করিবে—বলিতে পারি না, কিন্তু, তোমার কাছে যে ক্ষমা পাইব, সে আশা এখনও আমার এ ব্যাকুল হৃদয়কে ছাড়িয়া যায়

নাই। তাই অনুরোধ করি—অনুরোধ কেন? প্রার্থনা করি—ভগিনি মণিমালিনি! তোমার স্নেহের রত্নমালার—আজন্মদুঃখিনী রত্নমালার—এই অপরাধ এবারের জন্য ক্ষমা করিও, এ জনমে জানিয়া শুনিয়া এমন অপরাধ, আর কখনও করিব না।

সত্যই আমি আজন্মদুঃখিনী, জন্মিবার অল্প দিন পরেই মা স্বর্গে গিয়াছেন—সংসারের যাহা সার, সন্তানের যাহা ঐহিক ও পারত্রিক অবলম্বন—সেই জননী স্নেহ হইতে, আমি আজন্ম বঞ্চিত। স্নেহময়ী জননীর পবিত্র মূর্ত্তি যার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয় নাই, এ সংসারে তাহার জীবন মরু-ভূমির ন্যায়—সদা সন্তপ্ত নীরস ও নিষ্ফল। তাহার পর, পিতা—আহা! আমার জন্য তিনি কত ক্লেশই না পাইতেছেন, জ্ঞান হইবার পর এপর্য্যন্ত, আমি এমন কোন কার্য্যই করি নাই, যাহাতে, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে সুখী বলিয়া বোধ করিয়াছেন। আমার জন্য—এই আজন্ম-দুঃখভাগিনীর জন্য, সকল সময়েই তিনি দুঃখিত, চিন্তিত ও বিপন্ন—এ কথাও তোমার অবিদিত নহে। আমি যেখানে যাই, সেই খানেই বিপদ্ উপস্থিত হয়। তোমাদের বাটীতে যে দিন আমার আগমন—সেই দিন হইতে এ পর্য্যন্ত, কত বড় বিপদের ঝড় যে, তোমাদের সুখের সংসারের উপর দিয়া বহিয়া গেল—তাহা ভাবিলে, এখনও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।

কাল—করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং অযাচিত হইয়া, তোমা-

দের গৃহ পবিত্র করিয়াছেন। তোমাদের সকল বিপদ্ তাঁহার পাদপদ্মের রজঃকণার স্পর্শে যে মিটিয়া গিয়াছে, ইহাতে যে আমি কি পর্য্যন্ত সন্তোষ অনুভব করিয়াছি, তাহা মুখে বলিয়া—বা পত্রে লিখিয়া, জানাইবার নহে। তবে এক্ষণে তুমি বলিতে পার যে,—যখন সকল বিপদ কাটিয়াই গেল, তখন, তুমি কেন অকস্মাৎ এমন কঠোরভাবে চলিয়া গেলে ?

কেন যে তোমাদের বাটী কাল রাত্রিতে ছাড়িয়াছি—তাহাই বলিবার জন্য আমার এই উদ্যম। কিন্তু স্নেহের মণিমালিনি ! না বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত ! অন্য কোন কারণে আমি তোমাদের বাটী ছাড়িয়াছি, এইরূপ ভাবিয়া, পাছে তুমি ব্যথা পাও, সেইজন্যই আমি তাহা বলিব। কিন্তু ভগিনি ! সে কথা তুমি যদি আর কাহাকেও না বল, তাহা হইলে, আমি বড়ই উপকৃত হইব।

কাল রাত্রিতে ভগবান্ যখন সেই বিস্ময়স্তব্ধ ও প্রমুদিত সভ্যমণ্ডলীর সহিত তোমাদের বাটী হইতে—তোমার শ্বশুর ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া, জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; সেই সময়ই আমার মনে উদিত হইল যে, আর তোমাদের বাটীতে থাকা আমার পক্ষে কোনরূপেই উচিত নহে। উচিত নহে কেন—তাহাও বলি, তোমাদের সংসারের মধ্যে যে ঘোর অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল, ভগবানের কৃপা-কটাক্ষে তাহা যখন মিটিয়া গেল, তখন, প্রভাতেই হউক—বা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই হউক, তোমার স্বামী

—আর তোমার দেবর মণিভদ্র নিশ্চয়ই বাটী ফিরিয়া আসিবেন, তুমি ত জান, মণিমালিনি! তাঁহার পলায়ন—আর সেই পলায়নব্যাপারে আমার হঠকারিতা! তিনি যখন বাটী ফিরিয়া আসিবেন, তখন এক বাটীতে, তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে, তাঁহার সহিত হয়ত আমার সর্ব্বদাই দেখা হইবে। যদি বল, তাহাতে ক্ষতি কি? বিশেষ ক্ষতি কি—তাহা যদিও এখনও আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু তাহা হইলেও, আমি ইহা বেশ বুঝিয়াছি যে, মণিভদ্রের অত নিকটে থাকাটা আমার পক্ষে বিপদের কারণ হইতে পারে। তুমি বলিতে পার যে, আমি যখন তোমার কাছে সেদিন,—মণিভদ্রকে বিবাহ করিতে আমার অসম্মতি নাই—এই কথা জানাইয়াছি, তখন এসব কথা আর কেন?—মণিমালিনি! আমার হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল, সেদিন তোমার কাছে, পিতার মনস্তুষ্টির জন্য, বিবাহ করিব বলিয়া—অঙ্গীকার করিয়াছিলাম সত্য, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিন্তু, দেখিলাম, আমার এ বিবাহ করা হইবে না—তাই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, আবার আমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এ জীবনে আমি কখনও সংসারিণী হইব না। বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনী হইয়া, আমরণ জ্ঞানের অনুশীলন ও পরহিতব্রত প্রতিপালন করিব—এই হইল আমার জীবনের স্থির উদ্দেশ্য। আমি জানি, ইহার জন্য আমার পিতা নিতান্ত দুঃখিত।

ইহারই জন্য, তাঁহার জীবন—এখন এক প্রকার বিড়ম্বনাময় হইয়াছে, তাহাও আমার অবিদিত নহে। কিন্তু কি করিব? আমার অদৃষ্টের লিপি আর এক প্রকারের। আমার আশা—পিতা আমার ধর্ম্মপ্রাণ, আমি বিবাহ না করিয়া, যদি নিস্বার্থ পরহিতব্রতে—পবিত্রভাবে আমার এই তুচ্ছ জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারি—তাহা হইলে, এমন এক দিন আসিবে, যে দিন আমার ধর্ম্মপ্রাণ পিতা—আমার এই কার্য্য উল্লাসের সহিত নিশ্চয়ই অনুমোদন করিবেন। আমি আরও বুঝিয়াছি, তোমাদের বাটীতে আমাকে একাকিনী রাখিয়া, পিতা যে হঠাৎ চলিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেও একটু গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সে উদ্দেশ্য আর কিছু নহে—আমার বয়স হইয়াছে, যদি পুরুষরত্ন মণিভদ্রকে দেখিয়াও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া—আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর—আমি বিবাহ করিতে সম্মত হই, তাহা হইলে, পিতার মনোরথ অনায়াসে সিদ্ধ হয়। পিতৃদেবের এ আশা যে একেবারে শূন্যের উপর গঠিত—তাহাই বা আমি কি প্রকারে বলিব? সেই রজনীতে—সেই অবস্থায়, অতি অল্প কালের জন্যই আমি মণিভদ্রকে দেখিয়াছিলাম, আর তাঁহার সহিত দুই একটা মাত্র কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু, সেই অল্প সময়ের দেখা—আর সেই দুই একটা কথা—ইহাতেই আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, আমার ন্যায় দুর্ব্বলহৃদয় রমণীর পক্ষে, সেই পুরুষরত্নের সম্মুখে থাকা

—আত্মসংযম রক্ষা করা, বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সংসার আমার কিছুতেই ভাল লাগে না—দুই দিনের জন্য রূপের মোহে ভুলিয়া—জন্মটাই বিফল করিব? না—তাহা আমি কিছুতেই পারিব না। সত্য সত্য বলি ভগিনি! তাঁহাকে প্রথম দেখিবামাত্রই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার হাত ধরিতে গিয়া, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল, আর—তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমার স্বর -বদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

তারপর—তিনি চলিয়া যাইবায় পর, কতবার—তাঁহার ভাবনা মনে উঠিয়াছে, আর তাঁহার সেই—শান্ত অথচ গম্ভীর—বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল—সেই নয়নদ্বয়, এ জীবনে আর দেখিতে পাইব কি না—এই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, কতবার অতর্কিতে নয়নের কোণে অশ্রুবিন্দু—দেখা দিয়াছে —এ সকল ত আর ভাল লক্ষণ নহে, রমণী জীবনে অধঃপাতের ইহাই ত পূর্ব্বসূচনা! কই, পূর্ব্বেও অনেক সুন্দর-শ্রীমান ও সৎকুলোৎপন্ন যুবককে দেখিয়াছি, কই, দেখিয়াত একবারের জন্যও মনের মধ্যে এমন গোলোযোগ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। তাই বলি, ভগিনি মণিমালিনি! প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া প্রলোভন বিজয় করিব, এইরূপ সাহস করাটা আমার ন্যায় দুর্ব্বলহৃদয় নারীর পক্ষে কিছুতেই উচিত নহে। তাই—আমি স্বয়ং হার স্বীকার করিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সংসারের সুখে আমার গাঢ় আসক্তি নাই,

যাহার মুখের দিকে চাহিলে, সংসারের নশ্বর সুখে স্পৃহা জন্মে, দুঃখের সংসারে সুখের আশায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কাছ থেকে দূরে থাকাই, আমার ন্যায় দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণীর পক্ষে শ্রেয়ঃ।

মণিমালিনি! মেয়ে মানুষে যে কথা বলিতে পারে না, এবং মেয়ে মানুষের পক্ষে যাহা বলাও উচিত নহে, তাহাই আমি তোমাকে বলিলাম। কেন বলিলাম—তাহাও বলি, আমি জানি, তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, সে ভালবাসার প্রতিদান দিবার যোগ্য বস্তু—আমার আর কিছুই নাই। যে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহার কাছে যদি মনের কথা গোপন করিতে হয়, তাহা হইলে, এ সংসারে বাঁচিয়া কি সুখ?

আমার যাহা বলিবার তাহা শেষ হইয়াছে। একটা কথা বাকী আছে—তাহাও বলি—

শ্রেষ্ঠিচত্বরের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও বণিক্ সুবর্ণগুপ্তের কন্যা 'নর্ম্মদার' সহিত আমার মথুরাতে পরিচয় হইয়াছিল, কাল রাত্রিতে তোমাদের বাটীতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া, আমার বড়ই উপকার হইয়াছিল, তাহারই সাহায্যে তাহাদেরই শিবিকায় চড়িয়া, আমি অনাথপিণ্ডিকের বাটীতে আসিয়াছি। নর্ম্মদা বড় ভাল মেয়ে; ভগবান্ নর্ম্মদার মনোরথ পূর্ণ করুন্। ইতি—

দুঃখিনী রত্নমালা।

মণিমালিনার পণ।

বসিয়া—বসিয়া—বসিয়া-- মণিমালিনী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রত্নমালার পত্রখানি পড়িল, তারপর পত্রখানা সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া. সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা গভীর চিন্তার স্রোত—তখন, তাহার মনের মধ্যে বহিতেছিল, একমনে এক দৃষ্টিতে সে একবার উপরে আকাশের দিকে তাকাইল, তখন, তাহার নয়নের প্রান্তে---অধরের অগ্রভাগে যেন অমানিশায় তড়িদ্‌বিকাশের ন্যায় ঈষৎ হাসির উদয় হইল, মনের অগোচরে তাহার জিহ্বা একটা কথা বলিয়া ফেলিল।

সে বলিল, রত্নমালা! তুমি এইবার ইচ্ছা করিয়া ধরা দিয়াছ, আমি আর তোমায় ছাড়িতেছি না।

এই কথা বলিয়া মণিমালিনা যেন একটু অপ্রস্তুত হইল, পত্রখানি --আবার কি ভাবিয়া, কুড়াইয়া লইল এবং অঞ্চলে বাঁধিল।

তাহার পর একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মণিমালিনী আপনা আপনি অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, প্রাণেশ্বর! এমন সময়ে তুমি কাছে নাই! এই কয়টা কথা বলিবার সময়ে তাহার চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।

পতি-বিরহবিহ্বলা পতিপ্রাণা মণিমালিনী তখন বসনের অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, দ্রুতপদে সেঘর পরিত্যাগ করিল।

উপায় প্রয়োগ।

মণিমালিনী পণ করিয়া বসিল যে, তাহাদের পিঁজরায় সে রত্নমালারূপ স্বাধীন পাখীটীকে—যেমন করিয়াই হউক, পুরিবেই পুরিবে, কিন্তু তাহা কাজে হয় কেমন করিয়া? তাহার সহায় বল, সম্বল বল, সে কেবল একমাত্র তাহার স্বামী সুভদ্র; কিন্তু সে স্বামী এখন কোথায়? মণিভদ্র ভগবানের আদেশে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সুভদ্র ত আসেন নাই! কেন আসেন নাই—একথা জানিবার জন্য মণিমালিনীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু, কেহই ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছে না, কেহ বলিতেছে, সুভদ্র বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছেন, কেহ বলিতেছে তা নয়—তিনি নাকি কাল সন্ধ্যা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত সন্ধান কেহই দিতে পারিতেছে না।

এইরূপ নানা প্রকারের কথা শুনিয়া, বিরহিণী পতিপ্রাণার হৃদয়ে যে কি উদ্বেগের ঝড় বহিতে লাগিল, তাহা অপরে কে বুঝিবে?

কোন প্রকারে দুঃখের আবেগ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া, সে তখন কর্ত্তব্য স্থির করিল এবং তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুসারে কার্য্যও করিতে আরম্ভ করিল।

সে নিভৃতে তাহার শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া, সকল কথা তাহাকে জানাইল এবং বলিল যে, রত্নমালার পিতাকেও এই বিষয়টী জানাইয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। মণিভদ্রের সহিত—তাহার পরমাত্মীয় বসুভূতির একমাত্র কন্যার বিবাহ হইলে—উভয় কুল অলঙ্কৃত হইবে, এ কথা তাহার শ্বশুরকে বুঝাইবার জন্য—মণিমালিনীর বিশেষ যত্ন করিতে হইল না। সামন্তভদ্র সময়ে বসুভূতিকে এই সকল কথা নিবেদন করিল এবং রত্নমালার পত্রের কথাও তাহাকে শুনাইয়া দিল। রত্নমালার বিবাহ হইবে—এই সুখের ভাবনায় বসুভূতির অন্তঃকরণ ক্ষণকালের জন্য পুলকিত হইল, কিন্তু, কিছুতেই বসুভূতির বিশ্বাস হইল না যে, তাহার কন্যা সত্য সত্যই বিবাহ করিতে সম্মত হইবে।

ক্রমে এই সকল ব্যাপার—অনাথপিণ্ডিকের মুখে ভগবান্ শুনিলেন, রত্নমালা ভিক্ষুণী হইয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই তিনি শুনিয়াছিলেন, এ দিকে সুভদ্র বাটী ফিরিয়া যায় নাই, সে বিনীতভাবে নির্ব্বন্ধসহকারে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেছে যে, তাহাকে ভগবান্ বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করুন্।

এই সকল ব্যাপার লইয়া, শ্রাবস্তীনগরে বণিক্‌পল্লীর মধ্যে বেশ আন্দোলনও চলিতেছিল, ভগবানের মুখে এই বিষয়ের একটা মীমাংসা শুনিবার জন্য—ক্রমে অনেকেই ব্যগ্র হইয়া পড়িল, অনাথপিণ্ডিকের মুখে এই সকল ব্যাপার অবগত

হইবামাত্র, ভগবান্ নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—তিনি বলিলেন, গৃহস্থাশ্রম ভাঙ্গিবার জন্য জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদয় হয় নাই জগতের যাবৎ জীবই যাহাতে দুঃখের করালগ্রাসে পতিত না হয় এবং নির্ব্বাণের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারে, ইহাই হইল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। নির্ব্বাণের পথ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত হউক—ইহাই হইল আমার অভিপ্রায়। সুতরাং, অদ্য হইতে আমি নিয়ম করিতেছি যে, যাহার পুত্র হয় নাই তাহার বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করিতে হইলে, পিতার অনুমতি অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। আর—স্ত্রীলোকের পক্ষেও নিয়ম এই যে, সমাজের ও শাস্ত্রের প্রচলিত নিয়মানুসারে—যে তাহার পরিরক্ষক থাকিবে, তাহার অনুমতি না পাইলে, কোন স্ত্রীলোকই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়া ধর্ম্ম সংঘে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

ভগবানের এ আদেশে সকল গৃহস্থই পরিতুষ্ট হইল, সামন্তভদ্রের এবং বসুভূতির ইচ্ছা ছিল না যে, এই অল্প বয়সে সুভদ্র, মণিভদ্র বা রত্নমালা—কেহই বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে। ইহাদের হস্তে সংসারের সকল ভার অর্পণ পূর্ব্বক—সামন্তভদ্র ও বসুভূতি দুইজনেই—স্বয়ং বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করিয়া, জীবনের শেষভাগ শান্তির সহিত অতিবাহন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং, রত্নমালা বা সুভদ্রের বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিবার পথ আপাততঃ রুদ্ধ হইল।

বসুভূতিও অনাথপিণ্ডিকের গৃহে আসিয়া বাস করিতে-লাগিল, সে প্রতিদিন রত্নমালাকে---এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া, অনেক বুঝায়। মণিভদ্রের স্বভাব—তাহার প্রতি ভগবানের অতিশয় স্নেহ—তাহার ভারত বিখ্যাত আভিজাত্য ও সম্পদ্—এ সকল কথা, কতবার কত প্রকারে বসুভূতি কন্যাকে বুঝাইল. কিন্তু, কন্যা কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত নহে, সে বলে,—অন্ততঃ আরও দুই বৎসর যাক্, পরে না হয় দেখা যাইবে; তাহার বিশ্বাস, বিবাহ -বিশেষ মণিভদ্রের সহিত বিবাহ -তাহার পক্ষে, আজন্ম সংকল্পিত পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায় হইবে। এইরূপ আরও নানা প্রকার যুক্তি, ক্রন্দন ও অশ্রুজল প্রভৃতির প্রয়োগে, রত্নমালা তাহার পিতাকে এই বিবাহ-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল, এক দিন কিন্তু, তাহার পিতা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বলিল,—রত্নমালা! মা! তোর কাছে আমার এই শেষ প্রার্থনা, তুই যদি আমার এই শেষ কথাটা না রাখিস্, তাহা হইলে, আর কিন্তু, আমাকে দেখিতে পাইবি না, পিতার এই ভাব দেখিয়া, কন্যা এবার একটু বিশেষ ভীতা হইল, সে পিতার বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত নয়নের দিকে চাহিয়া, কান্দিয়া ফেলিল এবং যোড় হাতে পিতার দিকে চাহিয়া, তিনি কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বসুভূতি কন্যার এই ভাব দেখিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইল, আরও করুণ

অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল মা, আমার প্রার্থনা এই যে, মণিভদ্রকে তোর বিবাহ করিতেই হইবে। পিতার কথা শুনিয়া, রত্নমালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে ধীরে ধীরে অথচ বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিল, পিতৃদেব! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—তবে আমারও এই একটী প্রার্থনা যে, আপনি বিবাহের পূর্ব্বে মণিভদ্রের সহিত একবার দেখা করিবার অনুমতি আমাকে দিদ এবং এই দেখা হওয়ার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, আমি যে মণিভদ্রকে বিবাহ করিব বলিয়া স্বীকার কবিয়াছি, একথাটা যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। কন্যার এই বিচিত্র প্রার্থনা শুনিয়া, বসুভূতি একটু বিস্মিত হইল এবং একটু বিরক্তও হইল। কিন্তু, কি করে? ভাল না লাগিলেও, অগত্যা—সে কন্যার প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

আবার দেখা।

সন্ধ্যা হইয়াছে—পূর্ণিমার চাঁদ—বিয়ে-পাগলা বরের ন্যায়, সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই সভাস্থলে উপস্থিত, অস্তাচলের শিখর হইতে পশ্চিম সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে, উদয় শৈলের দিকে চাহিতে চাহিতে—সূর্য্যও ক্রম নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল, সূর্য্যের ভয়ে—এদিকে, আকাশ কিন্তু, চাঁদকে সম্পূর্ণ দখল দিতে এখনও যেন নারাজ। সূর্য্যের এই অন্যায় অবস্থিতিতে লজ্জিত তারাসুন্দরীগণ—বাসরে নামিয়া হাসিতে হাসিতে বরকে বরণ করিবার অবসর পাইতেছে না। তবে—উহাদের মধ্যে দুই একজন নিতান্ত বেহায়াও ত আছে, তাহারা কিন্তু, সূর্য্যের অস্তে যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে অনাথপিণ্ডিকের বিশাল গৃহলগ্ন এক বিস্তৃত পুষ্প-বাটিকার মধ্যে—বিশাল সরোবরের তীরে অবস্থিত—একটী সুন্দর দ্বিতল বাটীর ছাদের উপর বসিয়া, রত্নমালা—তাহার পিতার সঙ্গে নানা কথা কহিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে, একজন ভৃত্য দূর হইতে বসুভূতিকে অভিবাদন করিল এবং জানাইল যে, মণিভদ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিম্নতলে অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি ভৃত্যের সঙ্গে বসুভূতি নীচে নামিয়া গেল ও

কিয়ৎকাল পরে মণিভদ্রকে সঙ্গে করিয়া, আবার সেই খানে ফিরিয়া আসিল।

তখন তিনজনে তাহারা তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ বেত্রাসনের উপর উপবেশন করিল। সামন্তভদ্র কেমন আছেন? রত্নভদ্র কি করিতেছেন? ইত্যাদি কয়েকটী সাধারণ ভাবের প্রশ্ন করিয়া, ও তাহার যথাসম্ভব উত্তর শুনিয়া, একটু পরেই বসুভূতি বলিল,—মণিভদ্র! আমি এখান হইতে স্থানান্তরে চলিলাম, তুমি আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত, আমার জন্য অপেক্ষা করিও। এই কথা বলিয়াই, কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, বসুভূতি সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

এ সময় সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্নাময় সুধাবর্ষণে—সুস্নাত ভুবনমণ্ডল যেন হাসিতেছিল, নীচে নগরের তলবাহিনী স্রোতস্বিনী তাপ্তীর মৃদুতরঙ্গাবলীর সহিত খেলিতে খেলিতে, সান্ধ্য সমীরণ চারিদিকে যুথি-জাতী-মল্লিকার মনোহর সৌরভভার ছড়াইয়া দিতেছিল। আর মাঝে মাঝে, উচ্চ স্বর লহরীতে কাণের ভিতর মধু বর্ষণ করিতে করিতে—আর হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে কেমন একটা অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতে জাগাইতে—দুই একটা পাপিয়া মাথার উপরিভাগ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

বসুভূতি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, রত্নমালা ও মণিভদ্র দুই জনেই নীরব—দুই জনেরই দৃষ্টি মাটীর

দিকে—কেহও কাহারও দিকে তাকাইতেছে না। বাহ্য জগতের সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য!—'শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী'তে চারিদিকে—সৌন্দর্য্যময় ভাবময় ও শান্তিময় প্রকৃতির সেই সুন্দর ছবি—দেখিবার জন্য, তাহাদের চক্ষু তখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে না—তাহাদের কাছে বাহ্য জগৎ তখন—লুপ্তপ্রায়, ভাবরাজ্যের কোন্ এক নিভৃততম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের চিত্ত—তখন কোন্ বিষয়ে একাগ্রতার অনুভব করিতেছিল, তাহা জানিবার উপায় কি?

অনেকটা সময় এই ভাবেই কাটিয়া গেল, অনেক কষ্টে—অনেক পরিশ্রমে—ভাবের আবেগ সম্বরণ করিয়া, রত্নমালাই প্রথমে মণিভদ্রের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই দৃষ্টিপাতে লজ্জা ও উৎকণ্ঠার ছায়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, মণিভদ্রের দৃষ্টি কিন্তু, তখনও মাটার দিকে। তখন রত্নমালাই অগ্রে কথা কহিল, সে কহিল; মণিভদ্র! সেদিনের কথা কি মনে আছে?

রত্নমালার কথা শুনিয়া, মণিভদ্র যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, প্রথমে সে কথা কহিতে পারিতেছিল না—অথচ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হইতেছিল, এই বিষম অবস্থা হইতে রত্নমালা—আপাততঃ ত তাহাকে রক্ষা করিল।

তাহার পর—যে রত্নমালা তাহাকে কারাগার হইতে উন্মুক্ত করিয়াছে—যাহার বিনয়নম্র অথচ সৎসাহসপূর্ণ

ব্যবহার দেখিয়া, সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল—আর সেই অস্তগমনোন্মুখ চাঁদের অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নার অব্যক্ত আলোকে, যে রত্নমালার আলুলায়িত-কুন্তল—সুন্দর সেই মুখ—আর সেই আকর্ণবিস্তৃত সমুজ্জ্বল—চারু নয়নদ্বয় ও সেই স্বর্গীয় দৃষ্টিপাত—প্রথমে দেখিয়া, সে আত্মহারা হইয়াছিল, সেই রত্নমালার সহিত, কি বলিয়া, এতদিন পরে অগ্রে আলাপ করিবে—তাহা ভাবিয়াই সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, সুতরাং, রত্নমালার প্রথমে কথা কহায়, মণিভদ্র এখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সে তখন বলিল—

"রত্নমালা সকলই মনে আছে, মনটা কিন্তু এখন আর সে দিনকার মত নাই—এই বলিয়া, মণিভদ্রও একবার রত্নমালার মুখের দিকে চাহিল।"

উত্তর শুনিয়া, রত্নমালা একটু বিস্মিত হইল ও একটু ভাবিল, তাহার পর আবার বলিল।

বুঝিলাম্ না—সে সময়ই বা তোমার মন কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনে আছে—মণিভদ্র! সেই রাত্রে—তোমার পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বে—তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে,—আবার কবে দেখা হইবে! মনে আছে—আমি কি বলিয়াছিলাম, মনে আছে কি—তোমার সেই প্রশ্নে আমি তখন একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম, পরে তোমার মুখের দিকে চাহিয়াও আমার সে বিস্ময় দূর হয় নাই। তাই আবার

জিজ্ঞাসা করি, বল মণিভদ্র! তুমি সে দিন—আবার আমার দেখা পাইবার জন্য, কেন অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে?

"শুন রত্নমালা! শুন—কেন তোমার মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার দেখা পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম—রত্নমালা! বলিতে লজ্জা কি? শুনিলেও কোন ক্ষতি নাই। তখন হৃদয়ে যে অভিলাষ জাগিয়াছিল, আজ তাহা চলিয়া গিয়াছে—সে অভিলাষ কোথায় মিশিয়া গিয়াছে! আছে মাত্র তাহার সেই স্মৃতি! জেতবনে ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে তোমার—না না—আমার উদ্ধারকারিণীর—কমনীয় মুখ খানি দেখিয়া যে বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—তোমার মুখের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক সুন্দর মুখ দেখিতে দেখিতে কোন্ সংসারীর হৃদয়ে সে বাসনা না জাগিয়া থাকে? ভগবানের কৃপায় আমার অন্তঃকরণের সে বাসনা দূর হইয়াছে, তাই আজ রত্নমালা! সেই দিনের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের জন্য, তোমার নিকটে সে দিন যে অপরাধ করিয়াছি—আমার পবিত্র কুলের অনুচিত যে ব্যবহার—করিয়াছি তাহারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, আজ আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। একবার তোমার সহিত একান্তে দেখা করিয়া, এই ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। ভগবানের ইচ্ছায়—আর, তোমার পিতার অনুগ্রহে, আজ আমার সেই মহাসুযোগ উপস্থিত

হইয়াছে, আমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারিব, সংসারী হইবার প্রবৃত্তি আমার আর নাই।

মণিভদ্রের কথা শুনিয়া, রত্নমালার সেই চির সঞ্চিত চিন্তাভারবিষণ্ণ বদনে—অকস্মাৎ যেন সন্তোষের শান্ত জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে—সে তখন, বড়ই সন্তোষ অনুভব করিল এবং বলিল।

"জানিনা মণিভদ্র—তুমি আমার কাছে এ পর্য্যন্ত কোন অপরাধ করিয়াছ কিনা? সে যাহা হউক, তোমার কথা মতই—তোমার অপরাধ মানিয়া লইয়া, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আচ্ছা বল দেখি মণিভদ্র! বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করিবার জন্য—তুমি যে এত দৃঢ়সংকল্প হইয়াছ—তাহা হইবে কি প্রকারে? শুনিয়াছি—তোমার পিতা না কি—কিছুতেই তোমাকে সঙ্ঘে প্রবেশে অনুমতি দিবেন না। এদিকে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, পিতার সম্মতি না পাইলে, কোন পুত্রকে তিনি—তাঁহার সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এরূপ অবস্থায় তুমি কি করিবে মণিভদ্র?"

"যতদিন পিতার সম্মতি না পাইব, ততদিন বাটীতেই থাকিব, কিন্তু তাই বলিয়া, বিবাহ করিয়া সংসার করা! না, কিছুতেই তাহা আমি করিতে পারিব না।" এই বলিয়া, মণিভদ্র একবার আবেগভরা নয়নে—রত্নমালার সেই ঔৎসুক্যপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিল। তাহারও নয়নদ্বয় তখন অব্যক্ত অশ্রুভারে যেন ছল ছল করিতেছিল। তখন

আবার সে কথা কহিল, সে বলিল, "শুনিয়াছি রত্নমালা! তোমার পিতাও ত তোমার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির-সঙ্কল্প, অথচ তুমিও না কি সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছ, এরূপ অবস্থায়, তুমি কি করিবে ঠিক করিয়াছ?"

"আমারও ত বিবাহ করিবার ইচ্ছা একেবারে নাই, কিন্তু কি করি—পিতা অত্যন্ত জিদ্ করিতেছেন, আমি আর কিছুতেই তাঁহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। আচ্ছা মণিভদ্র! একটা কথা বলি—তুমি কেন আমাকে বিবাহ কর না?" এই কথাটী বলিবার সময় রত্নমালার গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল।

কথা শুনিয়া ত মণিভদ্র অবাক্! অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল ও পরে বলিল—"তাহা কি করিয়া হইবে রত্নমালা! তুমিও বিবাহ করিতে চাহ না, আমিও বিবাহ করিব না বলিয়া স্থির করিয়াছি, এইরূপ অবস্থায় তোমার সহিত আমার বিবাহ কি প্রকারে সম্ভব? এবং সে বিবাহে লাভই বা কি?"

"সেই জন্যই ত বলি মণিভদ্র! তোমারই সহিত আমার বিবাহ হওয়া উচিত।"

কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না বলিয়া, মণিভদ্র আবার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে—রত্নমালার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, রত্নমালা বলিতে লাগিল—

"সেই জন্যই ত বলিতেছি, মণিভদ্র! তোমারই সহিত

আমার বিবাহ হওয়া উচিত, আমাদের এই বিবাহে—দেখিতেছি, উভয়ের আত্মীয়বর্গের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তাহার পর—বিরক্ত ও নির্ব্বাণপ্রেমিক সাধক যে কারণে বিবাহ করিতে চাহে না, এ বিবাহে সে ভয় করিবার কোন কারণ থাকিবে না। ভগবানের কৃপা যদি আমাদের প্রতি থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমরা এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব. এক্ষণে, মণিভদ্র! তুমি কথাটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ।”

এতক্ষণে—মণিভদ্র ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিতে পারিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সে ভাবিল, এই সকল ব্যাপার লইয়া তখন তাহারা দুইজনে অনেক কথা কহিল। শেষে বিদায়ের সময়—মণিভদ্র স্থির ও অকম্পিত স্বরে রত্নমালার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল “ভাল রত্নমালা! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—সংসারে থাকিতে হইলে, একটা না একটা সঙের সাজ পরিতেই হইবে. তখন—দেখা যাক্. এই নূতন সঙের সাজ পরিয়া. আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি কিনা। আমি সম্মত হইলাম. তাহাই হইবে, তোমারই সহিত আমার বিবাহ হইবে। তখন হাসিমুখে গৌরবের দৃষ্টিপাতে—মণিভদ্রকে ধন্যবাদ দিয়া, রত্নমালা কহিল—আজ হইতে মণিভদ্র! এ সংসারে তোমার ও আমার স্বার্থ এক হইল, বিবাহের যাহা কিছু গুণ, আমরা যেন—তাহা সকলই উপভোগ করিতে পারি, আর—বিবাহের যাহা কিছু দোষ, আমরা যেন তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে পারি

—ইহাই যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের ফলে।” এই কথা বলিয়া, আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, রত্নমালা সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসুভূতির অপেক্ষায় মণিভদ্র সেই খানে বসিয়া রহিল, সেই সময় এক নূতন ভাবনার সমুদ্রে সেডুবিয়া পড়িয়াছিল।

বিবাহ ও সংসার।

বসুভূতি ও সামন্তভদ্র দুই জনেই এই বৃদ্ধবয়সে পরম আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। মণিভদ্র ও রত্নমালার পরস্পরের সম্মতি হইয়াছে, বিবাহ হইবে—এ সমাচার শীঘ্রই নগরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলেই এ বিবাহে সন্তোষ প্রকাশ করিল। ভগবানের আদেশে সুভদ্র বাটী ফিরিয়া আসিল, সে মণিমালিনীর সহিত বিবাহের উদ্যোগে—বিলক্ষণ যোগ দিল। বড় জাঁকের বিবাহ। ভারতের সকল বড় বড় মহাজন দিগের নিকট নিমন্ত্রণ গেল। চারিদিক হইতে সমাগত আত্মীয়গণের আনন্দ-কলরবে অনাথপিণ্ডিক ও সামন্তভদ্রের গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল।

সাক্ষাৎ ভগবান্ শাক্যসিংহ সেই বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মাসাবধি ব্যাপিয়া, এই বিবাহের আমোদে শ্রাবস্তী

তোলপাড় হইতে লাগিল। পরে ক্রমে মণিভদ্র ও রত্নমালাকে বেশ মনোযোগের সহিত সংসারের কার্য্যে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া, সামন্তভদ্র ও বসুভূতি সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পবিত্র দিনে—ভগবানের পবিত্র আদেশে, তাহারা দুইজনেই বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। সেই শান্ত ও সমাধিনিরত ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া, বসুভূতি ও সামন্তভদ্র—তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায়—আর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলনে জন্ম-জন্মান্তরাগত দুঃখময় সংস্কারগুলি মিটাইতে মিটাইতে—নির্ব্বাণের শান্তিময় পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই প্রকারে—শ্রাবস্তীতে শান্তি ও সদ্‌ভাবের সঙ্গে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভগবান্ শাক্যসিংহ আবার রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনাথপিণ্ডিকও বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইল। সে বসুভূতি ও সামন্তভদ্রের সহিত শ্রাবস্তীর বিহারেই রহিল, ভগবান্ তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন্।

এ দিকে ফুলশয্যার রাত্রিতে—রত্নমালা ও মণিভদ্র যখন পত্নী ও পতির বেশে—শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, সেই সময়েই, তাহারা ভগবানের পবিত্র নাম লইয়া শপথ করিল যে, তাহারা নিভৃতে কেহ কাহারও অঙ্গস্পর্শ করিবে না, রাত্রিকালে একই বিছানায় শয়ন করিবার সময়, এক জনে যখন ঘুমাইবে আর একজন তখন জাগিয়া থাকিবে। আর যখন দুইজনেই জাগিয়া

থাকিবে—তখন তাহাদের মধ্যে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং ভগবানের পবিত্র উপদেশানুসারে ধ্যান ও সদালাপ ছাড়া, অন্য কোন সাংসারিক কথা বার্ত্তা হইবে না। এই ভাবে, প্রতিজ্ঞাপালন করিতে করিতে—তাহারা দুইজনে, তাহাদের সেই কার্য্যতঃ সন্ন্যাস—অথচ বাহ্য—গৃহস্থাশ্রম পালন করিতে লাগিল। তাহাদের এই ভিতরকার রহস্য—অপর কেহই জানিতে পারিল না। দিন দিন যৌবনের ক্রমিক পরিণতির সঙ্গে রত্নমালার দেহে যেন লাবণ্য আরও ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সেই নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র দেবীর ন্যায় মূর্ত্তি যে দেখে সেই বিস্মিত হয়, তাহারই হৃদয় আপনা আপনি নত হইয়া আসে। মনের মধ্যে কোন প্রকার ক্লেশ না থাকায় এবং যথা নিয়মে ধর্ম্মময় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করায়, মণিভদ্রেরও মনোহর মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে আরও সুন্দরতর দেখাইতে লাগিল সকলেরই ধ্রুববিশ্বাস হইল যে, মণিভদ্র ও রত্নমালার পরস্পরের প্রতি দাম্পত্যপ্রেম অকৃত্রিম ও অসীম। বাস্তবিকও তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিরহে অল্পক্ষণেই ব্যাকুল হইয়া উঠে। রত্নমালাকে ছাড়িয়া, মণিভদ্র একদিনের জন্যও প্রবাসে কোন কার্য্যের জন্য যাইতে হইলে—বড়ই ক্লেশ বোধ করে। সর্ব্বদা লোকসমক্ষে হাস্য পরিহাসময় ব্যবহার, মিষ্ট আলাপ, সহাস্য বদন ও ঐকান্তিক সহানুভূতি—এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহও ঘুণাক্ষরে স্থান পাইল না। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল,

রত্নমালার গর্ভে একটী দৌহিত্র সন্তান দেখিবার জন্য, বসুভূতি মধ্যে মধ্যে বড়ই ব্যস্ত হইত—অদৃষ্ট কিন্তু তাহার সে সাধ পূর্ণ করিল না। যাহা হউক, সে না হয় —বন্ধ্যাই হইল, সংসারিণী ত হইয়াছে, এই ভাবিয়াই বৃদ্ধবর্গ কোন প্রকারে সন্তোষ লাভ করিলেন। ক্রমে কালের বশে সামন্তভদ্র ও বসুভূতি দুইজনই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, মণিমালিনীর একটী ছেলে হওয়ায়, সামন্তভদ্রের জীবদ্দশাতেই, তাহার অনুমতি লইয়া, সুভদ্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইল, তাহার পত্নী মণিমালিনীও সামন্তভদ্রের মৃত্যুর পরই, শিশু পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার—রত্নভদ্র ও তদীয় পত্নী লীলার হস্তে সমর্পণ করিয়া, ভগবানের আদেশে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিল। এদিকে রত্নভদ্র ও লীলা কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপরই সংসারের সকল ভার বিন্যস্ত করিয়া, অধিকাংশ কালই তীর্থ যাত্রায় অতিবাহিত করিতে লাগিল। সংসারের কর্ত্তা ও গৃহিণী হইয়া, মণিভদ্র ও রত্নমালা—বেশ মনোযোগের সহিত সামন্তভদ্রের সেই বিপুল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

———

বিদায়।

শ্রাবণ মাস—অমাবস্যার রাত্রি—আকাশ ঘন মেঘে আবৃত; অবিশ্রান্ত ভাবে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে। দিগ্‌মণ্ডল ঘন সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত, রাত্রিও দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে। সামন্তভদ্রের সেই বিশাল অট্টালিকার ত্রিতলে একটী সুসজ্জিত গৃহে মণিভদ্র ও রত্নমালা শুইয়া আছে! রত্নমালা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মণিভদ্রের ঘুমাইবার যো নাই, যতক্ষণ রত্নমালা ঘুমাইবে, ততক্ষণ সেই বিছানায় জাগিয়া, তাহাকে চৌকি দিতে হইবে, ঘুমের ঘোরে তাহার অঙ্গ—নিজের দেহ স্পর্শ না করে, এই জন্য তাহাকে জাগিয়া থাকিতে হইতেছে। শুধু আজ কেন—বিবাহের পর হইতে এ পর্যান্ত—প্রতি রাত্রিতেই, তাহাদের এইরূপ ব্যবহারই চলিতেছে।

মণিভদ্রের চক্ষুতে ঘুমও আসিতেছে না, সে সেই বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, আজ যেন—তাহার মনটা কি রকম ব্যাকুলের ন্যায় বোধ হইতেছে, সংসারের অনিত্যতা ও অসারতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, তাহার চিত্ত ক্রমেই যেন সংসারের উপর বেশী পরিমাণে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে এমন সময়—অকস্মাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। সেই উন্মুক্ত বাতায়নপথে বর্ষার শীতল বায়ু সুপ্তসুন্দরীর বক্ষঃস্থলের আবরণ বস্ত্র লইয়া, ক্রীড়া করিতে-

ছিল। এমন সময় সেই সমুজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকে গৃহ আলোকিত হইল,—সেই শিথিলবসনা আলুলায়িত কুন্তলা অনিন্দ্যসুন্দরী রত্নমালার নিদ্রাবেশমনোহর সুন্দর মুখের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য—সেই বিদ্যুতের ছটায় যেন শতগুণ উজ্জ্বল ও মনোহর বলিয়া বোধ হইল।

আবার বিদ্যুৎ চমকাইল, মণিভদ্র অকস্মাৎ যেন আত্মহারা হইয়া, সস্পৃহ ভাবে সেই নিদ্রিতা সুন্দরীর স্বপ্ন কম্পিত চারু অধরের প্রতি—একবার চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার প্রাণ যেন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবে নাচিয়া উঠিল, এই আকস্মিক ভাবের আবেগে—সে আপনাকে আপনি লজ্জিত বলিয়া বিবেচনা করিল। এমন সময় আবার একবার সৌদামিনীর বিকাশ হইল, এইবার কিন্তু মণিভদ্রের বোধ হইল—যেন, নিদ্রিতা রত্নমালার যে আলুলায়িত কেশগুলি পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ হইতে নিম্নে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, সেই চুলগুলি ধরিয়া, একটা সাপ শয্যার উপর উঠিতেছে। হঠাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া, আশঙ্কিত মণিভদ্র তাড়াতাড়ি ফিরিয়া, যেমন সেই সর্পটীকে আঘাত করিবার জন্য হস্ত চালনা করিল, সেই সময় সে একটু যেন বেসামাল হইয়া পড়িল। তাহার দক্ষিণ বাহু একেবারে রত্নমালার সেই অনাবৃত বক্ষের উপর আসিয়া পড়িল, তাহার বোধ হইল যেন—তাহার নিঃশ্বাসের সহিত রত্নমালার নিঃশ্বাস মিলিয়াছে, সেই সময় রত্নমালার গণ্ডদেশও তাহার গণ্ডদেশে পৃষ্ট হইল। হঠাৎ

এই ব্যাপারে রত্নমালারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে—জড়সড় হইয়া, সে তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, তখনও মণিভদ্রের বাহু তাহার স্কন্ধে সংলগ্ন ছিল !

মণিভদ্র একটু অপ্রস্তুতের ন্যায় নিজের হাত খানি সরাইয়া লইল, তখনও তাহার দেহে কিন্তু, রোমাঞ্চ বিরত হয় নাই, সে তখনও একটু একটু কাঁপিতেছে। ব্যাপার কি—তাহা বুঝিতে না পারিয়া, রত্নমালা স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—স্বামিন্ একি ?

তখন, ধীরে ধীরে—মণিভদ্র তাহার আকস্মিক সেই ভয়ের কথা রত্নমালাকে বুঝাইয়া দিল। কি কারণে, এইরূপ হইল—তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া, রত্নমালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—শেষে সে বলিল,—প্রিয়তম ! স্বামিন্ ! অদ্যকার ব্যাপার দেখিয়া, আমার বোধ হইতেছে—প্রলোভনের বস্তু নিকটে থাকিলে, আমাদের ইন্দ্রিয় সকল সময়ই বিকৃত হইতে পারে। শুধু তুমি কেন ? এই দেখ —নিদ্রিতাবস্থায়ও তোমার সেই অতর্কিত স্পর্শে—আমার দেহও বিকম্পিত হইয়াছে, এই দেখ—আমার শরীরে এখনও রোমাঞ্চ বিরত হইতেছে না, তোমার এই অতর্কিত স্পর্শে কেমন একটা মোহময় বিকার যেন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। না প্রিয়তম !—আমাদের এইভাবে এই দুরন্ত প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া থাকিবার আর প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের মনের সন্তোষের জন্য—আমরা এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, তাঁহারা ত স্বর্গে

চলিয়া গিয়াছেন। আর তবে আমাদের এই কণ্টকাবৃত পথে থাকিয়া লাভ কি ?

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মণিভদ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল ঠিক বলিয়াছ রত্নমালা ! আর আমাদের এই বৈরাগ্যের হৃদয় লইয়া, সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া লাভ কি ? এই রাত্রিতে—এই শুভক্ষণে, এস আজ আমরা দুইজনে মিলিয়া এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি—আজি হইতে মণিভদ্র রত্নমালার স্বামী নহে, আর রত্নমালাও মণিভদ্রের পত্নী নহে, জয় ভগবান্ বুদ্ধের জয় ! জয় সঙ্ঘের জয় ! জয় ধর্ম্মের জয় ! আমিও আজি হইতে প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলাম।

তখন রত্নমালা করজোড়ে মণিভদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, চক্ষুর জলে বক্ষঃ সিক্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিল

"যাও প্রাণেশ্বর ! ধর্ম্মের পথ—সঙ্ঘের পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে, ঐ শুন স্বর্গের দেবতারা তোমার যশোগান করিতেছেন, তোমার ন্যায় মহাপুরুষের অনুগ্রহ পাইয়াছিলাম বলিয়াই ত, আমি—আজ এত সহজে এই সংসারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, আমাকেও নাথ ! অনুমতি কর, আমিও যেন তোমারি পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া, সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পাই।

"তাহাই হইবে রত্নমালা ! তোমারই ইচ্ছা সফল হউক, আর কেন, এস আমরা বিদায় হই।"

"বিদায়"—কান্দিতে কান্দিতে রত্নমালা বলিতে লাগিল,